শিল্প কথা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দি কালচার পাবলিশার্স
৬৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয় সূচী

লেখকের সাহিত্য-বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ

সাহিত্যিকা

রূপ ও রস

আধুনিকী

রবীন্দ্রনাথ

মৃতের কথোপকথন

বাংলার কবি-মনীষী (যন্ত্রস্থ)

শিক্ষা ও দীক্ষা

শিল্প কথা

শিল্প কথা

শিল্পীর প্রতিভা জীবনের সৃষ্টিতে। যে বস্তু তিনি গড়েছেন তা জীবন্ত হয়েছে কি? তাঁর রং রেখা, তাঁর ধ্বনি, তাঁর বাক্য এমন মূর্ত্তি পয়েছে কি, মনে হয় যার অঙ্গে ছুরি চালালে টস্ টস্ করে রক্ত ঝরবে? নে হয় কি, তিনি যে জিনিষ দিয়েছেন তা গড়া বা তৈরী করা কিছু নয়, তা যেন ভগবানেরই সৃষ্টি, বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ—শিল্পী নিমিত্ত াত্র হয়ে তাকে প্রকাশ করে ধরেছেন? যা ছিল যবনিকার অন্তরালে ্পী তাকে কেবল আবরণখানি সরিয়ে সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করেছেন? র এই যে জীবন তার নানা ধারা হতে পারে—অন্তরের বাহিরের, লর সূক্ষ্মের, উপরের নীচের, দেহের প্রাণের মনের অধ্যাত্মের—দেবতার দানবের পিশাচের পশুর পর্য্যন্ত; তাতে শিল্পের দিক থেকে বিশেষ কছু আসে যায় না। শিল্পী তাঁর রঙ্গমঞ্চকে যথাতথা স্থাপন করতে পারেন, তাঁর উপকরণ যেথাসেথা হতে আহরণ করতে পারেন—এদিক দিয়ে তিনি নিরঙ্কুশ। প্রশ্ন হল তার মধ্যে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছেন কি না, তাঁর হাত সেই জীয়ন কাঠি কি না যার স্পর্শে সব কিছু বেঁচে ওঠে, জেগে ওঠে—মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তি। তা যদি হয়, তবেই শিল্পীর শিল্প সার্থক। শ্লাল বা অশ্লাল, আধ্যাত্মিক বা লৌকিক, াত্মিক বা ব্যবহারিক—সকলেরই মধ্যে জীবন সমান ভাবে জীবন্ত ফুটতে পারে।

উপনিষদের

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং

কিম্বা কালিদাসের

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী ;

দুটি দুই লোকের কথা কিন্তু উভয়েই সমান জীবন্ত প্রাণবন্ত। দান্তে যখন তত্ত্বকথা বলেছেন—

In la sua volontà è nostra pace.*

কিম্বা নেকড়েবাঘের চেহারা এঁকে দেখাচ্ছেন—

di tutte brame
Sembiava cerca nella sua magrezza. †

উভয়ত্রই অনুভব করি দান্তের নিজস্ব প্রাণসার।

জীবন অর্থ যে কেবল বাস্তব জীবন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ জীবন হতে হবে, এমন প্রয়োজন নাই। শিল্পী তাঁর চেতনার, তাঁর প্রাণের সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে যে জিনিষ যতখানি সচেতন সজীব করে ধরেছেন তাই তত সত্য তত বাস্তব—স্থূল ভৌতিক সত্যের বা বাস্তবের সাথে তার সম্বন্ধ, সংযোগ কি সাদৃশ্য কিছু নাই থাকুক। শিল্পীর মায়াবী শক্তিই হল সৃষ্টি শক্তি। এই বিশ্বজীবনকেও ত বলা হয় অদ্বিতীয় সৎপুরুষের মায়াশক্তির লীলা—যে শক্তির কল্যাণে অসত্য সত্য বলে প্রতিভাত এবং যাকে বলা হয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। শিল্পী তাঁর অন্তর থেকে, বাহির থেকে, এ-লোক থেকে ও-লোক থেকে তাঁর জগৎটি নিয়ে আসতে পারেন—যেমন তাঁর মায়াবী শক্তির মর্জ্জি। তাই ত কবি বলেছেন—

"কি এসে যায় তুমি কোথা হ'তে এসেছ, হে সুন্দর! স্বর্গ হতে কি নরক হতে।"††

---

* তাঁরই ইচ্ছার মধ্যে আমাদের শান্তি।

† তার শীর্ণতায় পুঞ্জীভূত যেন বিশ্বের বুভুক্ষা।

†† "Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe, O Beauté !"
—Baudelaire

শিল্প কথা

জিজ্ঞাস্য শুধু, এ-জগৎ বাস্তবিক একটা জগৎ হয়েছে কি না; একটা জগতেরই নিবিড় অভ্রান্ত উপলব্ধি দেয় কি না—নিজের সত্যে তা জাগ্রত স্পন্দিত কি না।

অন্য দিকে জীবনের কথা হলেই যে তা জীবন্ত হয়ে উঠবে এমন নয়। প্রত্যক্ষের বাস্তবের কর্ম্মআয়তনের সকল দাপট মালসাট থাকলেও তা নির্জীব প্রাণহীন হয়ে পড়তে পারে—যেমন ভলতেয়ার-এর "হেনরিয়াদ" (Henriade)। গান্ধার শিল্পের বস্তুতান্ত্রিক জীবন-রূপায়ণ দেখিয়েছে কেবল আড়ষ্টতা—অথচ নটরাজের অ-লৌকিকতায় কিন্তু সকল জীবন যেন স্পন্দিত নন্দিত। তাই আমার বোধ হয়, আধুনিকের অতিবাস্তবতার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীনের রূপকথা বেশী বাস্তব। শেক্সপীয়রের পরী, দান্তের এঞ্জেল সয়তান, কালিদাসের গন্ধর্ব্বকিন্নর বাল্মীকির যক্ষঃরক্ষ জাগ্রত জীবন্ত শক্তির প্রতিমূর্ত্তি সব।

পূর্ণ সত্য বা গভীরতম উচ্চতম সত্যকে দেখাতে শিল্পী বাধ্য নন। জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে অনেক সময়ে মনে হ'তে পারে শিল্পীর সত্য সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শী—তা অজ্ঞানের অর্দ্ধজ্ঞানের বা বিকৃত জ্ঞানের প্রায় পাশাপাশি হয়ে চলেছে। কিন্তু তাতেও স্রষ্টা হিসাবে শিল্পীর ক্ষতি কিছু হয় না। সত্যের পূর্ণতা—উদারতা, গভীরতা উচ্চতা—নয়; শিল্পী দিতেছেন সত্যের প্রাণবত্তা। অবশ্য বলা যেতে পারে সত্য যেখানে পূর্ণতম, জীবনও সেখানেই সব চেয়ে সজীব। হতে পারে—কিন্তু তেমন জ্ঞানের কথা বললেই যে তা জীবন্ত হবে, তা নয়; তার অপেক্ষা অনেক ছোট সত্যও তার চেয়ে স্থানে স্থানে অনেক বেশী জীবন্ত হতে পারে—এরই নাম শিল্পীর হাতের গুণ।

প্রথমে হল জীবন। সজীবতা শিল্পের আদি লক্ষণ। কারণ শিল্পী হলেন স্রষ্টা। কিন্তু স্রষ্টা অর্থ রূপস্রষ্টা; তাই রূপ—সৌন্দর্য্য হল শিল্পের দ্বিতীয় গুণ। এই জন্যই শিল্পীকে বলা হয় রূপকার। শিল্পীর

সৃষ্টি হবে সজীব, আবার হবে রূপবান। তবে জীবনের যেমন নানা ধারা, রূপেরও তেমনি নানা ছাঁচ। রূপ অর্থ অঙ্গ-সৌষ্ঠব হতে পারে—অঙ্গের গড়নে সমাবেশে একটা অনুপাত সাম্য ; একে বলা যায় চারুতা শোভনতা। আর হতে পারে—অঙ্গের ভঙ্গীতে একটা ভাগবত দ্যোতনা-গত সুষমা—একে বলা যেতে পারে শ্রী, লাবণ্য। এক হল অঙ্গের আকারগত আর এক হ'ল প্রকারগত সৌন্দর্য্য। এক সীমায় গ্রীকদের সুঠাম সুসীম পরিমিতি, অন্য সীমায় আধুনিকের নিরঙ্কুশ উদ্দাম মুক্তগতি।

একদিকে প্রাক্‌সিতেলা (Praxiteles), আর একদিকে রোদিন (Rodin)। একদিকে সংযত সুসঙ্গত মার্জ্জিত মসৃণ দেহবন্ধ—যেমন মিলতনের

And where the River of Bliss through midst of Heaven
Rolls o'er Elysian flowers her amber stream,

কি ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থের

Ethereal minstrel ! Pilgrim of the sky !

অন্যদিকে বাধন ছাঁদন হারা উন্মার্গ উচ্ছলতা, যেমন হপকিন্‌সের (Hopkins)

The flower of beauty, fleece of beauty, too, too apt to,
ah ! to fleet,
Never fleets more, fastned with the tenderest truth
To its own best being and its loveliness of youth.

কিম্বা আরও আধুনিকের ইচ্ছাকৃত বিষমতা, রুক্ষ কর্কশতা, যেমন বট্রাল (Ronald Bottral)

Is it worth while to make lips smile again,
To transmit that uneasiness in us which craves
A moment's mouthing......

শিল্প কথা

একদিকে রবীন্দ্রনাথের—

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মত

কি

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে—

আর অন্যদিকে, ধরুন বুদ্ধদেব বসুর

সুন্দর না হ'লে যদি জীবনের পাত্র হ'তে কোন ক্ষতি.
ক্ষয় নাহি হয়
সুন্দর হবার গূঢ়, দুরূহ সাধনা—
ক্লেশকর তপশ্চর্য্যা
কে আর করিতে যায় তবে ?

কিম্বা চরমে যদি পৌঁছাতে চান, তবে প্রণব রায়ের

মদের সঙ্গে নারী, মাংস ও ঠুন্‌কো ভাড়াটে প্রেম
যেখানে বিক্রি হয়
দরদাম করে টাকা দিয়ে কিনে তা-ই !

ফলত এক হিসাবে মোটের উপর বলা চলে যে আধুনিক শিল্পী স্বরূপের কথা ভাবেন না—শিল্পের এ দিকটা অনেকে একেবারেই ছেঁটে দিতে চেয়েছেন। জীবন, জীবনের প্রকাশ, জীবনের সু-প্রকাশ—সুন্দর প্রকাশ নয়, সম্যক প্রকাশ—এই হ'ল শিল্পের আদি মধ্য শেষ। তবে জীবন বলতে আধুনিকেরা বুঝেন জীবনের এক খণ্ড অংশ, এক বিশেষ ধারা, বিশেষ ভঙ্গী। আগে জীবন ছিল একটা বৃহত্তর পূর্ণতর গভীরতর স্রোত—শুদ্ধতর না হলেও, কর্ম্মের ভোগের আবেগের—ভাল মন্দ নিয়ে, ষড়রিপু বা ষড়ৈশ্বর্য্য

নিয়ে—একটা ভরাট সমর্থ লীলা। জীবন অর্থ তখন ছিল প্রাণশক্তিরই স্বরূপের প্রকাশ। বর্ত্তমান যুগে জীবন অনেকখানি সঙ্কীর্ণ ও অগভীর হয়ে এসেছে। আগে জীবন ছিল মনের কাছাকাছি জিনিষ, মনোময় পুরুষের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; এখন জীবন যতদূর সম্ভব দেহের সীমানায় টেনে আনা হয়েছে—জীবন হয়েছে অন্নময় পুরুষের একান্ত দাস। জীবন হ'ল রক্তে কোষে, শিরায় স্নায়ুতে, স্থূল ইন্দ্রিয়ে মগজে অণুর বা শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। জীবনের যে প্রাথমিক বা—আদিম অবস্থা—জড় যেখানে সবে প্রাণে পরিণত হয়ে চলেছে—সেই প্রত্যন্ত লোকের রহস্য আজ-কালকার চেতনাকে মুগ্ধ এবং মুহ্য করেছে।

অবশ্য এই সাফাই এখানে দেওয়া যেতে পারে যে সুরূপ বা কুরূপ নয়, শিল্পের কথা হ'ল রূপ বা স্বরূপ। জিনিষকে যথাযথ ব্যক্ত করা প্রকাশ করে ধরা—এই হ'ল সমস্ত কারিগরী। সন্দেহ নাই। তবে পক্ষান্তরে আবার বলা যেতে পারে রূপ—শিল্পগত রূপ অর্থই সুরূপ—স্বরূপ আর সুরূপ অভিন্ন বস্তু। সুরূপ ছাড়া স্বরূপ হয় না।

একথা সত্য, রূপ কি হ'লে সুরূপ হয় আর কি হলে হয় না, তার সীমানা নির্দ্দেশ সহজ নয়। গ্রীক আদর্শের সুরূপ আমাদের চেতনাকে এতখানি অভিভূত করে রেখেছে যে অন্য রকমের সুরূপ কল্পনা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু গ্রীকের সুরূপ আছে বলে ভারতীয় রূপে যে সুরূপের অভাব হয়েছে তা নয়। গ্রীকের রূপবন্ধে প্রধানত দেখি অঙ্গের ঢালাই —প্রত্যেক অঙ্গ সব দিক দিয়ে যাতে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ তিনটি মাত্রাই যাতে সমান মর্য্যাদা পায়, সর্ব্বত্র দেখা দেয় একটা পরিমিতি অনুপাত, ক্রম, একটা মসৃণতা। ভারতীয় শিল্পী ঢালাই বা বলনকে প্রধান করেন নাই—তাঁর কাছে প্রধান হল চলন—বলনকে চলনের সহায়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। চলন অর্থ গতি ও স্থিতি দুইই। তাই বেধ— ইউরোপীয় শিল্পে যাকে বলা হয় perspective (পরিপ্রেক্ষা)—ভারতীয়

শিল্পী তা বাদ দিয়ে রেখেছেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুটি মাত্রার উপর তিনি নির্ভর করেছেন; অঙ্গের পরিপূর্ণতা, পরিপুষ্টতা—সুডৌল—দেখাবার জন্যও, গ্রীকের মত বেধকে একান্ত প্রয়োজন মনে করেন নাই। পটের সমতল ক্ষেত্রকে সমতল হিসাবেই গ্রহণ করেছেন, তাকে প্রকৃতির অনুযায়ী অসমতল করে দেখাবার ছলা কলা তিনি আয়ত্ত করেন নাই। গ্রীক বা গ্রাক প্রভাবান্বিত চিত্রে তাই পাই ভাস্কর্য্যের রীতি। আর ভারতীয় ভাস্কর্য্যেরও মধ্যে পাই চিত্রের পদ্ধতি। কিন্তু এখানে একটি রহস্যের কথা এই যে উভয়েরই মধ্যে রয়ে গেছে আবার একটা প্রতিপূরক ধারা—গ্রীকের কাব্যে বলনের সাথে সাথে, বলনকে ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে চলনের স্বরূপ, ভারতের কাব্যে রূপ পেয়েছে ভাস্কর্য্যের বলন, নিটোল, আপূর্ণ আকার!

গ্রীকের রূপ, ভারতের রূপ ছাড়া রূপের আরও প্রকার ভেদ থাকতে পারে—এবং সে সব যে সুরূপ না হয়ে কুরূপ বা অ-রূপ হবে এমনও হয়।

কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারের গভীর জলে আর আমরা যাব না। সুরূপের সীমানা মরুমরীচিকার মত যতই সরে সরে দূরে চলে যাক না—তবুও সাধারণ বোধে আমরা অনুভব করি না কি রূপের ও রূপের অভাবের মধ্যে আছে কোথাও একটা রেখা? জীবনের সম্যক প্রকাশ মাত্রই সুরূপ নয়।

আধুনিকেরা এই রেখা হয়ত অস্বীকার ক'রেছেন—কিন্তু স্বীকার করলেও তাঁদের মর্য্যাদাহানির কোন ভয় নাই। আমরা শিল্প সৃষ্টির যে প্রথম গুণটির কথা বলেছি তার জোরেই অনেক শিল্পী অমর হয়ে আছেন। সেক্সপীয়রকে সুরূপের শিল্পী বল্‌তে অনেকেই ইতস্ততঃ করতে পারেন—কিন্তু তাঁর সৃষ্টি যে সজীব প্রাণোচ্ছল তাতে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নাই। মোটের উপর ইংরাজী কবি-প্রতিভা বোধ হয় এই প্রকৃতির। গ্রীক-লাতিন-ফরাসী ইহার বিপরীত। সেখানে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সুরূপের উপর—আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য

সম্বন্ধেও এই কথা বলা যেতে পারে। স্বরূপকেই এখানে শিল্পের বৈশিষ্ট্য করে ধরা হয়েছে ; এমন কি জীবনের সজীবতাকে হ্রাস করেও, একটা কৃত্রিমতাকে বরণ করেও অনেকে চেয়েছেন রূপকে সুষ্ঠুতর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে। তবে এই দুইএর সম্মিলন যেখানে সেখানেই সোনায় সোহাগা। শিল্পের এই উভয় অঙ্গকে সমান মর্য্যাদা যাঁরা দিয়েছেন,—যেমন বাল্মীকি হোমর—তাঁদের শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হবে বৈ কি !

শিল্প ও জীবন

শিল্পকলা জীবনের অভিব্যক্তি, পুষ্পিত বিকাশ। জীবন থেকে জীবনের শিরোমণি হয়ে ফুটে উঠেছে শিল্প। জীবন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে, এই একদিকে—কিন্তু অন্যদিকে শিল্পও আবার জীবনকে জন্ম দিতেছে, জীবনের বিকাশে সহায়তা করে চলেছে, জীবনের মধ্যে পরিবর্ত্তনের পুনর্গঠনের সম্ভাবনা এনেছে।

তবে অনেকে হয়ত কথাটা স্বীকার করতে চাইবেন না। তাঁরা বলবেন শিল্প ও জীবনকে যতদূর সম্ভব আলাদা করে, পরস্পরের অস্পৃশ্য করে রাখাই যুক্তিযুক্ত। উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল বড় জোর যেন সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ—অর্থাৎ একান্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল—পরস্পরের সামীপ্যের প্রভাবের ফলে প্রকৃতি হারায় তার সাম্য, হয়ে পড়ে চঞ্চল পঙ্কিল,—আর পুরুষেও এসে দেখা দেয় অজ্ঞান সম্মোহ। অন্য কথায় চারুশিল্প সুন্দর (beautiful) না হয়ে, হয়ে পড়ে দরকারের ব্যবহারের জিনিষ (useful)—অহেতুক আনন্দের বস্তু না হয়ে, হয়ে পড়ে উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়মাত্র, সে উদ্দেশ্য যতই সাধু হোক না কেন ; শিল্পী রসিক না হয়ে, হয়ে পড়েন প্রচারক। শিল্পকে জীবনের সাথে জুড়ে দিয়ে, জীবনের সেবক, তল্পীদার করে তোলবার প্রচেষ্টাকেই "বাণী-সেবকদের বিশ্বাসঘাতকতা" (La Trahison des Clercs) নাম দিয়ে Julien Benda এই কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্যমহলে বিষম সোরগোল তুলেছিলেন। আর আজকালকার রুশের সমস্ত সোভিয়েট সাহিত্যের শিল্পকলার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই আনা হয়েছে। তা ছাড়া, জীবনের সাথে শিল্পকে জড়িয়ে মিশিয়ে ফেললে যে কেবল শিল্পের মুণ্ডপাত হয় তা নয়, জীবনও তাতে হয়ে পড়তে পারে খঞ্জ

পঙ্গু, দুর্ব্বল অক্ষম। এই আশঙ্কার জন্যই যাঁরা সাহিত্যিক মন দিয়ে জগৎকে সংস্কার করবার বা গড়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁদের কাজে অনেকে সর্ব্বান্তঃকরণে সায় দিতে পারে না। তবে একথাও বলা হয় কবি-রাজ্য কবিদের স্বপ্ন, মানসিক বিলাসই বেশীর ভাগ—বাস্তবে সত্যসত্যই তার সাথে সাক্ষাতের আশঙ্কা বা ভরসা খুব কম।

জীবন ও শিল্প হ'ল তাই দুটি বিভিন্ন স্তরের বা ক্ষেত্রের জিনিষ। পারতপক্ষে স্বীকার করা যেতে পারে তারা যেন দুটি সমান্তরাল রেখা, পাশে পাশে চলেছে বরাবর, কিন্তু কোথাও পরস্পরকে স্পর্শ করে না, এতটুকুও মিলে যায় না—এক বোধহয় পরিশেষে অনন্তের মধ্যে গিয়ে ছাড়া। শিল্পের উৎপত্তি জীবন থেকে নয়, জীবনের প্রেরণাও সাহিত্যের মধ্যে নয়। উভয়ের জন্ম আলাদা, লক্ষ্য আলাদা; ধর্ম্মকর্ম্ম আলাদা।

শিল্প ও জীবনে এই দ্বৈধ বৈপরীত্য যদি থেকেই থাকে, তবে তার কারণ ও-দুটিকে তাদের সত্যকার স্বরূপে না দেখে, দেখা হয়েছে ওদের একটা সঙ্কীর্ণতর বাহ্যতর রূপে। জীবনকে মূলতঃ প্রধানতঃ ধরা হয় প্রাকৃত (অর্থাৎ পাশব) বৃত্তির অদম্য লীলাখেলা হিসাবে, যাকে নিয়ন্ত্রিত বশীভূত করে রাখবার নিরর্থক নিষ্ফল চেষ্টা হয়েছে কতকগুলি রীতিনীতি, মনগড়া বিধিব্যবস্থার সহায়ে। আর শিল্পকেও মোটের উপর বিবেচনা করা হয় কেবল চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, জীবনের রূঢ়তা তিক্ততা হতে ক্ষণকালের মুক্তি, আরাম—কল্পনার, খোসখেয়ালের, স্বপ্নবিলাসের লাস্য—একেবারেই অহেতুক আনন্দের উচ্ছ্বাস, একান্ত অপ্রয়োজনের অব্যবহার্য্যের অতিরিক্ততা। কিন্তু জীবনকে ও শিল্পকে এভাবে কোথাও কোথাও বা সচরাচর দেখা হলেও তা সত্য দেখা কি পূর্ণ দেখা নয়; উভয়ের মধ্যে যে কেবল অন্যোন্যাভাবেরই সম্বন্ধ থাকতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নাই।

শিল্প ও জীবন যদি পরস্পরকে স্পর্শ না করেই বরাবর চলতে থাকে—তাদের মিলবার মিশবার সম্ভাবনা এক যদি থাকে কেবল

অনন্তের মধ্যে, তবে ত সমস্যাটি সমাধানের ইঙ্গিত স্পষ্ট রয়েছে ঐখানেই—শিল্পকে অনন্তের চেতনায় উন্নীত করে ধরতে হবে, জীবনকেও গড়তে হবে ঐ অনন্তেরই অনুপ্রেরণায়।

শিল্প সম্বন্ধে কথাটি হয়ত একান্ত অভিনব বা অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ শিল্পের স্বরূপই বলা হয়ে থাকে একটা কিছু আনন্ত্যের অভিব্যক্তি—অন্ততঃ অধিকাংশ শিল্পীশ্রেষ্ঠেরাই একথা বলে থাকেন। জীবনের সাথে শিল্পের বিরোধও ঠিক এই দিক দিয়ে—কারণ, জীবনের কারবার হল ক্ষুদ্রকে খণ্ডকে সসীমকে নিয়ে আর ক্ষুদ্র খণ্ড সসীমভাবে। সব কবিরাই চেয়েছেন জীবনের এই গণ্ডী ভেঙ্গে, এই বাহ্যতা ছিঁড়ে একটা কিছু গভীরতর বৃহত্তর বস্তুকে আবিষ্কার করতে, প্রকট করতে। তথাকথিত অতি-আধুনিকেরাও ক্ষুদ্রকে বাহ্যকে তুচ্ছকে নিয়ে যতই মত্ত থাকুন না, তাঁহাদেরও সৃষ্টি শিল্পরসে অমৃতায়িত হয়ে উঠেছে তখনই—তাঁরাও অনেকে একথা স্বীকার করেন—যখন তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে একটা কিছু আনন্ত্যের দ্যোতনা, একান্ত ইন্দ্রিয়-পরিচ্ছিন্ন নয় এমন কোন চেতনার বা সত্তার ইঙ্গিত। আর জীবনকেও কেবল লোকায়ত-জীবন করে রাখাই সর্ব্বত্র একমাত্র কর্ত্তব্য ও সম্ভাব্য বলে বিবেচিত হয় নাই। জীবনকেও সেই আনন্ত্যের সুরে ও ছাঁদে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টাই হল অধ্যাত্ম-সাধনার নিগূঢ় মর্ম্ম। নীতির সদাচারের সাময়িক সঙ্কীর্ণ শৃঙ্খলা নয়, কিন্তু পরম মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বিধৃত দিব্য ছন্দই অধ্যাত্মের লক্ষ্য। কবি হিসাবে যিনি মহান শ্রেষ্ঠ, জীবনের ক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দেখি তিনি অতি সাধারণ, এমন কি সাধারণেরও নীচে হয়ত। অবশ্য জীবনে মানুষ হিসাবে তুচ্ছ হলেও, শিল্পীর শিল্পমহত্ত্ব তাতে কিছু খর্ব্ব হয় না—শিল্পীর জীবনকে ভুলে, দেখা উচিত কেবল তাঁর শিল্পকে। কথাটি ঠিক —কিন্তু এতে শিল্পীর অন্তরাত্মার একটি রহস্যকে, শিল্পসৃষ্টির একটি পূর্ণতর অভিব্যক্তির সম্ভাবনাকে আমরা অবহেলা করি।

শিল্প কথা

শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে যে সত্যের সুন্দরের সন্ধান পেয়ে থাকেন অর্থাৎ যে চেতনার বলে তিনি রূপদ্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা, তাকে শুধু ক্ষণিকের নয় কিন্তু সর্ব্বদার, স্বপ্নের কল্পনার ভাবের নয় কিন্তু জাগ্রতের, চঞ্চল নয় কিন্তু স্থির, ব্যতিক্রম নয় কিন্তু স্বাভাবিক করে তোলাই হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। জীবনকে গঠিত শাসিত করবার জন্য, সার্থক করবার জন্য যে সকল রীতিনীতি বিধিব্যবস্থা সাধারণতঃ আশ্রয় করে চলা হয় দেখি, শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রায়ই তা যথেষ্ট উদার গভীর বা সমুচ্চ বলে বোধ হয় না—বরং মনে হয় জীবনের বৃহত্তর নিবিড়তম অভিব্যক্তির পক্ষে অন্তরায়। সেই জন্যই অনেক শিল্পী, যাঁদের চেতনা একটা লোকোত্তর সত্যের সুন্দরের প্রভাবে পরিপ্লুত, একটা বৃহৎ মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্যে লীলায়িত তাঁরা জীবনের পরিচিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চলেন, তাঁদের প্রাণ সাধারণ সর্ব্বজনসম্মত ছাঁচের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। বহু কবি শিল্পীরাই জীবনের স্বাভাবিক কাঠামকে ভেঙ্গেছেন বা ভেঙ্গে ফেলতে চেয়েছেন—তাঁদের সৌন্দর্য্য-রচনার মধ্যেও তাঁদের এই প্রয়াসের ও আকৃতির দোল ফুটে উঠেছে; কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে নূতন চেতনার অনুরূপ ছাঁচ গড়বার প্রতিষ্ঠা করবার কৌশল বা সাধনা তাঁরা আয়ত্ত করেন নাই। আবার অবশ্য এমন শিল্পীও আছেন যাঁরা শিল্পের দিক হতে লোকোত্তর দ্রষ্টা স্রষ্টা হয়েও অন্যদিকে—বাস্তবে কর্ম্মায়তনে—সাধারণ নৈমিত্তিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তার বিধিব্যবস্থা সব মেনে নিয়ে চলেছেন—যেমন, শেক্সপীয়র স্বয়ং।

অন্তরে লোকোত্তর শিল্পদৃষ্টি, বাহিরে স্থূল প্রাকৃত-দৃষ্টি—শিল্পীর এই দুটি দিক কোনরকমে না মিশে একেবারে পৃথক হয়ে থাকতে পারে। শিল্পী যখন সৃষ্টি করেন তখন একটা একান্ত অন্তর্মুখী সমাধির অবস্থায় তাঁর অন্য সত্তাটি সম্পূর্ণ ভুলে হারিয়ে ফেলতে পারেন; আবার সহজ জীবনে

যখন ফিরে আসেন তখন তাঁর কবিসত্তাকে তাকের উপর তুলে রাখতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় এরকম সম্ভব হয় না—ঐ দুটি দিকের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকে, এবং তাদের মধ্যে যদি একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয়, তবে সংঘর্ষ ঘটে। তার ফলে জীবনে যে কেবল ব্যর্থতা আসে তা নয়, শিল্পশক্তিও অনেক সময় ক্ষুণ্ণ খর্ব্ব হয়ে পড়ে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে এই রকম একটা কিছু ঘটেছিল বলে কেউ কেউ নির্দ্দেশ করে থাকেন। অবশ্য ব্রাউনিং যে অপরাধের উল্লেখ করেছেন—একমুঠি সোনার জন্যে আমাদের দিশারী আমাদেকে ছেড়ে গেলেন—সেটি স্থূল কথা; পদ অর্থ মান সম্ভ্রম সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভনে যদি কবির পদস্খলন হয়ে থাকে, তবে সেটি একটি সূক্ষ্মতর অধঃপতনের প্রতীক। কবি তাঁর কবিচেতনায় পেয়েছেন যে উপলব্ধি, যে সত্যের সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ স্পর্শ, শিল্প-হিসাবেও তার সম্যক প্রকাশের রূপায়ণের জন্য অনেক সময়ে দেখা যায় কেবল বাঙমানসের সাড়া ও সাহচর্য্যই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন হয় প্রাণের শারীরচেতনার পর্য্যন্ত অনুমতি ও সহযোগ, আর প্রাণ এবং শরীর নিয়েই ত জীবন। অন্য কথায়, সমগ্র জীবনটি যখন কোন না কোন রকমে মূল শিল্পীচেতনায় অনুপ্রাণিত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখনই শিল্পটির সম্যক স্ফূরণ সম্ভব। (ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিদৃষ্টি যখন তাঁর জীবনধারায় উন্মুক্ত পথ না পেয়ে কঠিন প্রতিবন্ধকে ব্যাহত প্রতিহত হয়ে পড়ল—তাঁর মনের প্রাণের দেহের সঙ্কীর্ণতা সংস্কার অসাড়তা যখন তাঁর উর্দ্ধতর চেতনাকে প্রত্যাখ্যান করে চলল তখনই তাঁর কাব্য-অনুপ্রেরণার উৎসও বিশুষ্ক হয়ে এল। কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থ কেন, আমার মনে হয় অনেক শিল্পীই, যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয় তাঁরা could not speak out—তাঁদের মুখ ফুট্‌ল না—এই এক কারণে ব্যর্থকাম হয়েছেন।)

জগৎকে জীবনকে একটা উত্তর চেতনার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেখা সকল শিল্পীরই সহজাত অবশ্যম্ভাবী বৃত্তি বলে মনে হয়। এই আদর্শ-

পরায়ণতাই শিল্পীকে কখন দৃশ্যমান স্থূলের রূঢ়তা ক্ষণিকতা ছাড়িয়ে unheard melodies, Elysian fields, magic casements প্রভৃতির স্বপ্ন দেখিয়েছে—কখন বা এই জগৎটিকে ভেঙ্গে চুরে প্রাণের মত করে গড়বার প্রেরণা দিয়েছে কিংবা এ সকল চেষ্টা নিরর্থক ভেবে একে শুধু কষ্ট করে সহ্য করে যেতে বলেছে—in this harsh world draw thy breath in pain—অথবা এরই মধ্যে ডুবে গিয়ে এরই থেকে একটা কিছু তীব্র অসাধারণ আনন্দ আবিষ্কার করতে উদ্‌যুক্ত করেছে। এই আদর্শপরায়ণতা যে শিল্পীর কেবল বিষয়বস্তুর ব্যাপার, শিল্পীর শিল্পরচনার তারতম্য এদিক দিয়ে হয় না—এমন কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। কারণ এই আদর্শপরায়ণতাই শিল্পীকে দিয়েছে তাঁর ছন্দের দোল, তাঁর রূপায়ণে প্রাণাবেগ। এই আদর্শপরায়ণতারই অন্য নাম কবি-দৃষ্টি।

শিল্পীকে যতখানি মনে করা হয় অথবা শিল্পী নিজেই যতখানি মনে করেন যে জীবনলীলায় তিনি রয়েছেন কেবল সাক্ষীগোপালের মত, তাঁর একান্তবাসে সমাহিত, বাস্তবিক পক্ষে ততখানি তিনি তা নন। হাতে হাতিয়ারে তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে আর পাঁচ জনার মত নেমে না যেতে পারেন, কিন্তু যে-সকল শক্তি বা বৃত্তি জীবনকে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত পরিচালিত করে, তাদের সাথে তাঁর রয়েছে একটা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, এবং এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, এই নিভৃত সহজ সংযোগ রয়েছে বলেই তিনি হতে পেরেছেন কবি—দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। শুধু শিল্পী হিসাবে অর্থাৎ জীবনের ভাব নিয়ে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা না হয়ে, জীবনের বস্তু নিয়েও দ্রষ্টা ও স্রষ্টা হয়ে ওঠা আর একটি ধাপের অপেক্ষা মাত্র।

জীবনের সাথে শিল্পের যে কতখানি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তার কিছু পরিচয় পাই ইতিহাসের একটি বিশেষ ঘটনায়। যখনই দেখি জীবনে নূতন জোয়ার দেখা দিয়েছে, প্রাণে ফুটে উঠেছে নূতন সামর্থ্য, কর্ম্মায়তন যখন সমৃদ্ধ, তখনই কি দেখা দেয় নাই যাকে বলা হয় শিল্পের স্বর্ণ যুগ?

শিল্প ও জীবন

প্রাচীন গ্রীসে পেরিক্লার যুগ, রোমে অগস্তের যুগ—রেণাসেন্সের ইতালীতে দশম লে'র যুগ, ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগ, ফরাসীদেশে চতুর্দ্দশ লুই'র যুগ—ভারতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের যুগ প্রভৃতি কি একই সত্যের প্রমাণ নয়? আর আমাদের এই অভিশপ্ত (?) বর্ত্তমান যুগেও শিল্পজগতে দেখছি যে বিপুল বহু প্রয়াস, নূতনের অভিনবের বিচিত্রের আবিষ্কার-অভিযান, তারও মূলে নাই কি জীবনেরই ক্রমবর্দ্ধমান আবেগ আকাঙ্ক্ষা আশাভরসা?

জীবনপ্রবাহে তরঙ্গমালার উতলে কেবল নয় পরন্তু নিতলেও যে শিল্পীর আবির্ভাব কোথাও কখন হয় না, তা নয়—তবে সেটি ব্যতিক্রম মাত্র। বেওশিয়া'র (Boeotia) মত দেশে পিন্দার, আর মধ্যযুগের একেবারে মধ্যভাগে দান্তে—দেখায় যেন নিবিড় আঁধারের কোলে বিজলী-চমক; কিন্তু এ হ'ল ব্যক্তিগত প্রতিভার কথা—দুই একটি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় শিল্পজ্যোতিষ্ক, ধূমকেতুর মত, এভাবে অপ্রত্যাশিত দেশে ও কালে প্রকট হতে পারে, কিন্তু তাঁরা যেন মানবচেতনার ক্রমবিকাশের যে প্রধান কক্ষা তার কিছু বাইরে—(কতকটা হয়ত intervention বা আকস্মিক অবতরণের মত, ঐ বিকাশেরই কাজ এগিয়ে দেবার জন্য)।

জীবনের সাধক হলে যে শিল্পসাধনায় এসে পড়বে খাদ মিশ্রণ অধঃপতন, এমন আশঙ্কা অমূলক। বরঞ্চ তাতেই শিল্প হয়ে উঠতে পারে মহত্তর—শিল্প-হিসাবেও সত্যতর সুন্দরতর। যখন গীতাকারের মুখে শুনি

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্

কিংবা উপনিষদ ঋষির

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—

তখন তা'তে কেবল অধ্যাত্ম-গৌরব নয়, কবিত্বেরও পাই চরমোৎকর্ষ।

জীবন-সাধক অর্থই ত এই, তিনি তাঁর সমস্তখানি, তাঁর দে
প্রাণমন দিয়ে এক পরম সত্যকে সৌন্দর্য্যকে ব্যক্ত করতে প্রয়াসী-
সত্যের সৌন্দর্য্যের নিবিড়তম রহস্যকে তিনিই পূর্ণতর ভাবে অধিগ
করেছেন। সুতরাং তিনি যদি বিশেষ শিল্পসৃষ্টিতে ব্রতী হন, তঁ
উপলব্ধি বা চেতনা যদি বাঙ্ময়, ধ্বনিময়, বর্ণরেখাময় হয়ে উঠতে চা
তবে তাঁরই হাতে শিল্প লাভ করে না কি তার পরাকাষ্ঠা ?

আধুনিকতার, অতি-আধুনিকতার প্রধান দুর্ব্বলতাই এইখানে
মানুষের একটা সঙ্কীর্ণ অংশ, বাহ্যবৃত্তি দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করতে সে চেয়ে
—প্রধানতঃ তার মগজ, তার স্নায়ব অনুসন্ধিৎসা দিয়ে। সকল শিল্প
অবশ্য মানস সৃষ্টি—কিন্তু শিল্পীশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দেখি তাঁদের মান
(সৃষ্টিকালে অন্ততঃ) তাঁদের জীবনের সমগ্রতাকে আপনার মধ্যে যে
তুলে নিয়েছে। আধুনিকের মানসসৃষ্টি কেবলই, একান্তই মানস—
মানুষের আর সব অংশকে নিজের বাহিরে রেখে, দূরে থেকে শুধু দেখেছে
পরীক্ষা করেছে। তাই আধুনিকতার মধ্যে দুর্লভ সামর্থ্য, সজীবতা,
সত্যের একটা মৌলিক মহিমা।

ভবিষ্যতের শিল্পীকে প্রথমে ফিরে যেতে হবে চেতনার সমগ্রতার
মধ্যে ; সমস্ত আধার দিয়ে উপলব্ধ সত্যের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ হবে শিল্প।
প্রাচীন শিল্পীতে এই সমগ্রতা ছিল ভাবগত, অন্তরাত্মার একটি একাগ্রতার
ফল। কিন্তু এই সমগ্রতা যদি হয় বস্তুগত অর্থাৎ মানুষ হিসাবে আধারে
জীবনে শিল্পীর সত্য যদি মূর্ত্ত হয়ে উঠে, তবে তাতে শিল্পও পাবে এক
অভিনব মাহাত্ম্য। কেবল কাগজে কলমে নয়, সেই সঙ্গে ক্রিয়
কর্ম্মেও শিল্পী তাঁর শিল্পপ্রেরণাকে মূর্ত্ত করে চলতে পারেন—ভবিষ্যৎযুগে
শিল্পীর পথই হবে তাই। শিল্পহিসাবে শিল্পীর পথ এক, জীবন-সাধক
হিসাবে পথ তাঁর আলাদা—এ ব্যবস্থার মূল্য তখন আর থাকবে না। কারণ,
শিল্পীর শিল্প হবে তাঁর জীবনসাধনার অভিব্যক্তি—যে সত্যকে সুন্দরকে

জীবন চায় শরীরী করতে তারই এক একটা প্রতিরূপ গড়ে তুলতে বিভিন্ন শিল্পের বিভিন্ন কাঠামো। তা ছাড়া, এখনও—চিরকালই কি শিল্পী তাঁর জীবনের সাধনাকে, অর্থাৎ জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে, আকৃতিকেই রূপ দিয়ে চলছেন না ?

তবে ভবিষ্যতের শিল্পী এই জীবন সাধনা সজ্ঞানে ত করবেনই, তাঁর লক্ষ্যও হবে চরম পরম সাধ্য একটা কিছু—পূর্ব্বে আমরা যে বলেছি, আনন্ত্যের মহিমা। এখনকার শিল্পীর মধ্যে রয়েছে যে দ্বৈধ বা আত্ম-বিরোধ, তার পরিবর্ত্তে শিল্পী আপনাতে পাবেন অখণ্ড ঐক্য, তাঁর প্রকৃতি দ্বিচারিণী না হয়ে, হয়ে দাঁড়াবে অচ্ছিদ্রা একনিষ্ঠা অনন্যভাজা।

তাতে শিল্পকে হয়ত পুরাতনের অনেক রস ও রূপ বর্জ্জন করে, অতিক্রম করে চলে যেতে হবে—কিন্তু বিবর্ত্তনের ক্রমোন্নতির নিয়মই তাই। ভবিষ্যতের শিল্পী অতীতের প্রাকৃত বৃত্তি নিয়ে যদি না'ই আর লিখতে পারেন—

> Vivamus, mea Lesbia, atque amemus...
> Da mihi basia mille deinde centum,
> Deinde—* (Catullus)

কিংবা,

> I fear thy kisses, gentle maiden,
> Thou needest not fear mine— (Shelley)

তাতে তাঁর শিল্পশক্তি কিছু খর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে না। তাঁর চেতনা যদি হয়ে থাকে জীবনের ঊর্দ্ধতর, বৃহত্তর, গভীরতর গতি ও বৃত্তি, তাঁর শিল্পেও ধরা দিবে লোকোত্তর চলন ও বলন।

---

* "এস প্রিয়ে, আমরা বেঁচে থাকি শুধু তুমি আমাকে ভালবাসবে, আমি তোমাকে ভালবাসব বলে। দাও আমাকে সহস্র চুম্বন, দাও আরও শত আরও···

শিল্প কথা

কবির আদি অর্থ ছিল ঋষি। এই দুয়ের মধ্যে ভেদ ক্রমেই বেড়ে চলে এসেছে। কিন্তু এখন কবিকে আবার ফিরে আর্ষ চেতনায় উঠতে হবে নব যুগের নব সৃষ্টির জন্য। জীবনের সাধনায় যে ঋষি—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভূত—শিল্পের রচনায় তিনিই হবেন পরম কবি।

কবি ও যোগী

সমালোচক, অন্ততপক্ষে সফল সমালোচক হলেন বিফল কবি—মাঝে মাঝে এ রকম বলা হয়। কবি নিজেও তেমনি আবার হলেন বিফল যোগী অর্থাৎ ভাল যথার্থ কবি হতে গেলে যোগী হওয়া চাই কিন্তু যে যোগী অসিদ্ধ ব্যর্থ—এ কথাটি কতদূর বলা যায় চিন্তা করছিলাম। এমন সময় দেখলাম একজন ফরাসী পাদরীপণ্ডিত সত্যসত্যই এ কথা বলেছেন এবং তা প্রমাণ করবার জন্য একখানা বই পর্য্যন্ত লিখেছেন।* অবশ্য মঁসিয় ব্রেমোঁ যোগী শব্দটি ব্যবহার করেন নাই, তিনি বলেছেন "মিসটিক" এবং মিসটিকের মর্ম্মগত ধর্ম্ম হল প্রার্থনা, ভগবৎ আরাধনা। আমরা তবে বলতে পারি যোগী, অধ্যাত্ম-সাধক বা শুধু সাধক—মোটের উপর অর্থ একই দাঁড়াবে।

ব্রেমোঁ কবিকে যে ভ্রষ্ট পতিত সাধক বলেছেন তার ব্যাখ্যা এই :—কবির যে আদি প্রেরণা, যে নিভৃত দৃষ্টি ও অনুভব তাঁর সৃষ্টির পিছনে রয়েছে তা হল একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি বা অধ্যাত্মমুখী অনুভূতি; কিন্তু গোড়ার এই লক্ষ্যের দিকে তিনি সোজা চলে যান নাই, তাকে পূর্ণ মূর্ত্ত অধিগত করবার চেষ্টা করেন নাই, মাঝপথে থেমে গিয়েছেন, একটা শাখাপথে নেমে গিয়েছেন; যে নিভৃত অনুভূতি অন্তরাত্মায় পেয়েছেন তাকে বাক্যের পোষাকে অলঙ্কারে সাজিয়ে গুজিয়ে ফলিয়ে—অর্থাৎ অনেকখানি আবৃত করে ও বিকৃত করে—জাহির করেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি তাঁর হয়েছে। অনুভূতিকে উপলব্ধি না করে, সত্তায় চেতনায় জীবনে জাগ্রত সক্রিয় না করে, তাকে কেবল কল্পনাগত স্বপ্নগত করে,

* Prière et Poésie—par l'Abbé H. Brémond (de l'Academie Française.)

কেবল মস্তিষ্কগত বিলাসের বস্তু করে রেখেছেন। শেষে অবস্থা এমন হয়েছে যে যে-অনুপাতে কবি সাধকের ধারা হতে সরে দাঁড়িয়েছেন সেই অনুপাতেই তিনি কবি হয়ে উঠেছেন। কারণ সাধনার সোজা পথ ধরে চলা অর্থ, কবিত্বের চোরাগলি এড়িয়ে যাওয়া, তার অর্থ কাব্যপ্রেরণার, কবিত্বের অবশ্যম্ভাবী বিলোপ।

প্রথম কথাটি তা হলে প্রথমে দেখা যাক। কবি আদৌ যোগী বা সাধক কি না এবং হলে কি হিসাবে। স্বপক্ষের যুক্তি এই যে প্রায় সব কবির মুখেই—কম পরিমাণে আর বেশি পরিমাণে—শুনি অদৃশ্য, অনন্ত, অতীন্দ্রিয়, দিব্য এই সকল বস্তুর উল্লেখ। সকল কবিরই আকূতি একটা লোকোত্তর জগতের দিকে, একটা পূর্ণাঙ্গ নির্দোষ সত্যের সৌন্দর্য্যের মাঙ্গল্যের দিকে। মিলতন বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা দান্তের কথা ছেড়েই দিতে হয়, তাঁরা ত স্পষ্ট অধ্যাত্মপন্থী। কিন্তু শেক্সপীয়র, যিনি মানব-প্রকৃতির একান্ত ঐহিক, নিতান্ত পার্থিব জীবনযাত্রার ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র দিয়েছেন, তিনি যখন বলেন—

So shines a good deed in this naughty world

অথবা There's a divinity that shapes our ends
Roughhew them how we will—

তখন কি অনুভব হয় না শেক্সপীয়রের অন্তরাত্মা নিভৃতে সংযুক্ত রয়েছে আর একটা লোকাতীত চেতনার মধ্যে, তাঁর দৃষ্টি একটা প্রচ্ছন্ন জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত? এমনকি যে সব কবিকে বলা হয় ঘোর বস্তুতান্ত্রিক, যাঁরা আদর্শবিমুখ, ভগবৎদ্রোহী তাঁদের বাহ্য বক্তব্য, "মুখের কথা" যাই হোক, তাঁরা কি Lucifer বা Prometheus-এর সগোত্র নন? যাঁদের সম্বন্ধে—যাঁদের "অন্তরের ব্যথা" লক্ষ্য করে—বোদলের বলেছেন—

Une Idée, une Forme, un Etre
Parti de l'azur et tombé

কবি ও যোগী

Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul oeil du Ciel ne pénètre—*

আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা বাহুল্য। তাঁর কাব্যপ্রেরণার মধ্যে ওতপ্রোত যে একটা অধ্যাত্ম আস্পৃহা এবং এই অধ্যাত্ম আস্পৃহাই যে তাঁর কাব্যপ্রেরণার মূলে তা বলবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মধুসূদনের মত "পাষণ্ড"-ও মাঝে মাঝে কি বলেন শুনুন—

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভবমায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ?—

মেঘনাদ বধের গোড়াতেও মধুসূদন শ্বেতভুজা ভারতীর আবাহন করেছেন। মধুসূদনের এই অনুভব বা সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব যে বীণাপাণি হলেন মোক্ষদাত্রী অর্থাৎ কাব্য হল মুক্তির সহায় ও উপায়—এটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অবশ্য এমন কবির একান্তই যে অসদ্ভাব যিনি কোথাও কখন অধ্যাত্মের বা অধ্যাত্মজাতীয় কিছু আদৌ উল্লেখ করেন নাই, তা হয়ত বলা চলে না (যেমন ধরুন লাতিন কবি কাতুল্ল (Catullus) যার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "He has as much philosophy in him as a red ant")। ব্রেঁমোর সিদ্ধান্তের বিপক্ষে তাই এঁদের দাঁড় করান যেতে পারে। তাঁরা যদি মুষ্টিমেয়ই হন, তাতেই সে সিদ্ধান্ত অপ্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু কথাটি ঠিক তা নয়। কবির লক্ষ্য ও প্রয়াস যে বাক্যের সহায়ে একটা জীবন্ত সার্থক জিনিষ গড়ে তোলা, একটা

* একটি ভাব, একটি রূপ, একটি সত্তা নীলিমা থেকে ছুটে এসেছে, পড়েছে গিয়ে নরকের পঙ্কিল ধূসর এক জলধারার মধ্যে, সেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই আর প্রবেশপথ পায় না।

সৌন্দর্য্য আনন্দসার সৃষ্টি করা তাই কি অতিলৌকিক, লোকোত্তরমুখী কিছু নয়? বিষয়বস্তুর মধ্যে, ব্যক্ত অর্থের মধ্যে ও-জিনিষের কোন উল্লেখ বা আভাস না থাকলেও যে নিবিড় আনন্দ সুষমা চমৎকারিত্ব তাকে ধরে ঘিরে রয়েছে তার সাদৃশ্য যোগীর সাধকের সাধ্যবস্তুর সাথেই কি নয়?

বিশ্বনাথ কবিরাজ ঠিক এই কথাই বলছেন। কাব্যের স্বরূপ বা আত্মা হল রস আর সে রস "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"—ব্রহ্মোপলব্ধিতে যে আনন্দ, ব্রহ্ম যে আনন্দে গঠিত তার স্বজাতীয় বস্তু কাব্যসৃষ্টির বা কাব্যাস্বাদনের আনন্দ, উভয়ে একই উৎস হতে নিঃসৃত। উভয়েই অখণ্ড-স্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময় এবং—এটি বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ—"বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য" অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সাথে উভয়েরই কোন সম্পর্ক নাই, এসকল উপকরণের উপর তাঁদের চিন্ময় অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ নির্ভর করে না। এই কথাই আমি পূর্ব্বে বলেছি যে কবির বাচ্য বক্তব্য যদি অধ্যাত্মবিষয়ক নাই হয় তাতে কিছু আসে যায় না—কবি যাই বলেন তা আসে এক নিগূঢ় চেতনা থেকে, যা হল "লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণী"।

সাহিত্যদর্পণকার আরও একটী গভীর অর্থগর্ভ কথা বলেছেন কাব্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্বন্ধে। কাব্যরস মলিন তমোগুণ বা বিক্ষুব্ধ রজোগুণ দ্বারা গ্রাহ্য হয় না—একমাত্র তা সত্ত্বের আশ্রয়ে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং কবিও যে সৃষ্টি করেন, তা তিনি সত্ত্বগুণের দ্বারা অধিকৃত হয়ে তবে সৃষ্টি করতে পারেন। কাব্যপাঠের ফলশ্রুতিও হল তাই সত্ত্বের উদ্রেক, রজ ও তম এই ইতর গুণদ্বয়ের দুষ্ট সংস্পর্শ থেকে প্রকৃতির শুদ্ধি ও মুক্তি। গ্রীক মনীষী আরিস্ততলের অনুরূপ সিদ্ধান্তটিও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি—ট্রাজেডির আছে যে চিত্তশোধনের ক্ষমতা (katharsis)। তবে বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যের মহত্ত্ব যে পর্দ্দায় তুলে ধরেছেন ততখানি আর কেউ উঠতে পেরেছেন কি না সন্দেহ।

কবি ও যোগী

বিশ্বনাথ কবিরাজের সাথে ব্রেমোঁর মূলতঃ পার্থক্য নাই। পার্থক্য কাব্যের উদ্ভব সম্বন্ধে নয়, পরিণতি সম্বন্ধে। কবির ভিতরের প্রেরণা, কবিত্বের উৎস যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি—ব্রেমোঁও বলছেন, তবে তিনি যোগ করছেন এই কথা যে সে-মুহূর্ত্তে সেই অনুভূতিকে ভাষার ছাঁচে ঢালছেন, ছন্দোবন্ধে ফলিয়ে ধরছেন, সেই মুহূর্ত্তেই কবি তাঁর নৈসর্গিক যোগী প্রকৃতির ধারায় সোজা না চলে নেমে গিয়েছেন একটা নিম্নতর প্রকৃতির ধারায়। অন্তরের ইষ্টকে নীরবে আপনার সমগ্র সত্তায় অঙ্গীভূত না করে, কেবল মুখের মুখরতায় বাহিরে ছড়িয়ে হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং তিনি হয়ে পড়েছেন মিথ্যাচারী—অসত্যপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক। যে বস্তুকে জীবন দিয়ে মূর্ত্ত করে তুলতে হবে, তাকে তিনি সহজে সস্তায় কথার মধ্যে নিঃশেষ করে রেখেছেন, কথার কথায় পর্য্যবসিত করেছেন। জীবনের শিল্পী না হয়ে তিনি অলীক কথার শিল্পী মাত্র হয়েছেন। সত্যকার পূর্ণ উপলব্ধির পরিবর্ত্তে একটা মধ্যবর্ত্তী আপাতরমণীয় লোকে—হয়ত স্বর্গলোকে—বস্তুকে প্রত্যাখ্যান করে কল্পনার বাঙ্ময় মায়িক সৃষ্টির মধ্যে তিনি মুগ্ধ মুহ্য হয়ে রয়েছেন। অপ্সরাদের নৃত্য বুঝি সাধককে ভুলিয়ে পথভ্রষ্ট করে রেখেছে। কবির বাকসর্ব্বস্বতার অসারতা কবি নিজেও সময়ে সময়ে যে অনুভব করেন না তা নয়—অসার বাক্যের সহায়েই আবার বাক্যের অসারতা প্রতিপন্ন করে আধুনিক এক কবি বলেছেন—

চাই না আর মনে মনে অঙ্গসঞ্চালন
চাই না আর মনে মনে দূর অভিযান
চাই না আর কলমের খোঁচায় বীরত্ব
চাই না আর শুধু সূত্রে-বাঁধা সৌন্দর্য্য*—

---

* Je suis las des gestes intérieurs
Je suis las des départs intérieurs !

আরিস্ততলের গুরু প্লেতো কাব্যের এই দিকটিই দেখিয়েছেন—কবিত্বের মায়িক শক্তির কথাই তিনি বলেছেন। কবির হল মনোহর কিন্তু মিথ্যার জগৎ—কবির মধ্যে বা কবির জগতে আধ্যাত্মিক কিছু নাই। প্লেতো ছিলেন ধর্ম্মের নীতির শাস্তা ও গোপ্তা—কবির উপর তাঁর অসন্তোষের প্রধান কারণ কবির হাতে (যথা, হোমর) দেবতারা যে মানুষেরও অধম স্বভাব ও প্রকৃতি পেয়েছে, এই অসত্য এবং কু-আদর্শ। অসত্যকে কু-আদর্শকে সুন্দর চিত্তাকর্ষক করে ধরে কবি মানুষকে তার সত্যের মাঙ্গল্যের, যথার্থ সুন্দরের সাধনা ও সেবা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

কাব্যের যে এরকম একটা অবিদ্যাত্মিকা মায়িক শক্তি আদৌ থাকতে পারে না তা হয়ত সব ক্ষেত্রে বলা চলে না। এবং কোন কোন কবি যে কাব্যের পথ ধরে অন্তরাত্মার সাধনাকে খর্ব্ব করেন বা আবৃত করেন এমনও হতে পারে। পাঠকের চিত্তেও এই ধরণের মোহ উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বলা উচিত দোষ কাব্যের নয়, কাব্যের নিজস্ব প্রকৃতির নয়—দোষ কবির ও পাঠকের অর্থাৎ মানুষ হিসাবে। এটি হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কথা। এভাবে দেখতে গেলে সংসারে এমন জিনিষ নাই যে সাধনার অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না।

সুতরাং ও কথা থেকে প্রমাণ হয় না বা সিদ্ধান্ত করা চলে না যে কবি মাত্রই ভ্রষ্ট বা পতিত যোগী। একটি উদাহরণেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হয়—উপনিষদের কবি। উপনিষদের কবি পূর্ণমাত্রায় যোগী ও ঋষি ছিলেন। উপনিষদ কবিত্ব হিসাবে যতখানি উৎকৃষ্ট, সাধনার মন্ত্র হিসাবেও ততখানি মহনীয়। কবি ও যোগী এখানে এক হয়ে, উভয়ে

Et de l'héroisme a coups de plume
Et d'une beauté toute en formules !
Charles Vildrac—"Livre d'amour"

উভয়ের অভিব্যক্তি হয়ে প্রমূর্ত্ত—পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ। বাক্ সত্যের কেবল মায়িক অধ্যাস বা আবরণ হবেই তা নয়; বাক্য যেখানে বাক্ বা শব্দব্রহ্মের বিগ্রহ সেখানে সে হয়ে ওঠে সত্যের চারুতম শিবতম স্বরূপগত প্রভা—যেমন সূর্য্যের কিরণ, অগ্নির শিখা।

কিন্তু তাই বলে আবার অন্যদিকে এমন অত্যুক্তিও করা চলে না যে কবি ও যোগী এক ও অভিন্ন—কাব্যরচনা ও যোগসাধনায় পার্থক্য নাই। কবির তবুও হল বাঙ্ময় জগৎ এবং সেটি মানসলোকের অন্তর্ভুক্ত। কবির যে অন্তরাত্মার জ্যোতি তা এই বাঙ্ময় মানসলোককে ভাস্বর, অধ্যাত্মপ্রবণ করে তোলে। কিন্তু যোগীর ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত ও বস্তুগত—কারণ যোগীর প্রয়াস প্রাণে ও দেহে অধ্যাত্মের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। কবি এই প্রয়াসের আরম্ভ হতে পারেন, সহায় হতে পারেন কিংবা শেষে জয়ের প্রকাশ বা ঘোষণাও হতে পারেন। কিন্তু কবি যোগীকে সরিয়ে তার স্থান গ্রহণ করতে পারেন না—যোগী হতে গেলে যে কবি হতেই হবে তা নয়। কাব্যপুরুষ ব্রহ্মসত্তার সহোদর যদিই বা হয়, তবুও সে স্বয়ং ব্রহ্মসত্তা নয়।

ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য

কাব্যের প্রাণ * ধ্বনি—এবং প্রতিধ্বনি। পাশ্চাত্যে একেই বলা হয় suggestiveness, ব্যঞ্জনা—কিংবা আধুনিক সমালোচক একজন যেমন নাম করেছেন, obliquity, তির্য্যকভাব বা বক্রোক্তি। অন্য কথায়, বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে তখন যখন বাক্যটি তার আক্ষরিক অর্থের মধ্যে শেষ না হয়ে আরও বেশী কিছুর প্রতি নির্দ্দেশ করে; আর এই অনুক্ত বেশি-কিছুর মাত্রা যত অধিক হয় কাব্যটিও তত কবিত্বময়, কাব্য হিসাবে মহীয়ান হয়ে ওঠে। আধুনিক কাব্য ও শিল্পের একটি ধারার বিশেষত্বই হল এই যে আর সব অঙ্গকে—ছন্দকে বিষয়বস্তুকে—একরকম অবহেলা বা অগ্রাহ্য করে সে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে—অবশ্য এক নিজস্ব ভঙ্গীতে—কেবলই নির্জ্জলা এই বেশি-কিছুটি, এই ধ্বনিটি।

আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেন যে কথার আছে তিনরকমের অর্থ—প্রথম, তার সাধারণ চলিত স্পষ্ট বা মুখ্য অর্থ, এর নাম অভিধা; দ্বিতীয়, একটা গৌণ, কখন কখন বলা হয় বক্র, অর্থ—এর নাম লক্ষণা, ইংরাজিতে যাকে বলে figurative sense; তৃতীয়ত এ দুটি ছাড়াও, এ দুটির অতিরিক্ত-কিছু বুঝাতে পারে, তার নাম ব্যঞ্জনা—আর একেই বলে ধ্বনি। তুলনা দিয়ে আরো বলা হয় যে একটা শব্দ হলে, শব্দটি যে স্থান হতে উঠে, ঠিক সেইস্থানে—তার সবচেয়ে বেশি স্থূলরূপ—শব্দের ঢেউ যতই সেই নাভীস্থান হতে দূরে চলে যায় ততই তা সূক্ষ্মতর হতে থাকে—এই অতিদূরের রেশ বা প্রতিধ্বনির মতনই হল কাব্যের ধ্বন্যাত্মক অর্থ।

---

* ধ্বনিকে আমি বললাম প্রাণ, আত্মাকে বলব রস—এই পার্থক্যটির ব্যাখ্যা ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল, বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে এ পার্থক্য স্মরণ না রাখলেও চলে।

ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য

কাব্যসৃষ্টির আদি, আদিম ও প্রাথমিক রূপ হল শুধু বিবৃতি—কাব্য-বস্তুর যথাযথ কথন—স্পষ্ট অর্থের ঋজু, পূর্ণ ও নিঃশেষ প্রকাশ। কাব্য তখন পদ্য মাত্র অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ বা মিত্রাক্ষর গদ্য—এখানে প্রথম অর্থটি, অধিক পক্ষে দ্বিতীয় অর্থটি ধরেই বাক্যের সকল বক্তব্য ফুরিয়ে যায়, আর কোন অর্থ বা ভাবের প্রয়োজন হয় না—আর কোন অর্থের বা ভাবের উদ্রেকও সে করে না। কিন্তু পদ্য কাব্য হয়ে ওঠে সেই শিল্পীর হাতে যিনি তাঁর বাক্যে এনে দেন তৃতীয় পর্য্যায়ের অর্থ—ধ্বনির অনুরণন, ভাবের তির্য্যকগতি, অনুক্তের অনুরঞ্জন। গ্রীক সাহিত্যে হেসিয়ড'এর পরে হোমর, ইংরাজীতে গাওয়্যার (Gower)এর পরে চসার এই রূপান্তরের ইন্দ্রজাল দেখিয়েছিলেন। বাংলায় চণ্ডীদাসের হাতে এই রকম একটা পরিবর্ত্তন ঘটেছিল মনে হয়।

অর্থের তৃতীয় পদ—ধ্বনি, তির্য্যকভাব, "বেশি·কিছু" বলতে ঠিক কি বুঝায়? শুনুন তবে প্রথমে স্কটের বিখ্যাত লাইন কটি—

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,
This is my own, my native land—

এটিকে নির্জ্জলা বিবৃতি বললে দোষ হবে না। এখানে অনুক্তের কোন রেশ নাই, কোন ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় না! যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি হয়ত বেশ জোরের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, পাঠকের প্রাণে তাতে উৎসাহ উদ্দীপনাও এনে দিতে পারে, কিন্তু যেমন ভাবে বলা হয়েছে তার মধ্যে বলার সমস্ত বিষয় শেষ হয়ে গিয়েছে—অতিরিক্ত, অধিকন্তু কিছুর ঈঙ্গিত নাই—সব স্পষ্ট খোলাখুলি। শুনুন এর পরে কবি গ্রে'র

The curfew tolls the knell of parting day.

একটা ভিন্ন, নূতন সুর, এখানে বোধ হয় না কি? একটা ঝঙ্কার ফুটে উঠেছে তা যেন ব্যক্ত অর্থকে ছাপিয়ে গিয়েছে, বাক্যটি শেষ হলেও যার

রেশ শেষ হয় নাই? আইয়াম্বের (Iamb) অভঙ্গ সমতাল আর ল'এর ও র'য়ের পুনঃপৌন্য জনিত ঘন রোল একটা কি অভিনবত্ব এনে দিয়েছে বাচ্যার্থের মধ্যে। তবুও কিন্তু এখানে ঠিক তির্য্যকভাবের নিজস্ব ভূমিতে আমরা উঠি নাই—এখনও রয়েছি লক্ষণারই যদিও একটা গাঢ়তর উচ্চতর পদে। আরও একটু চলুন আগে—শুনুন ওয়ার্ডসওয়ার্থের

Will no one tell me what she sings

এখানে বোধ হয় নাকি হাওয়ায় ভেসে কোন উর্দ্ধলোকে চলে গিয়েছি? বাক্যটি অবলম্বন মাত্র অর্থের দিকেও মন আকৃষ্ট হয় না—যে সুর এখানে তরঙ্গিত মনে হয় দূরে বহু দূরে চক্রবাল অতিক্রম করে সে গিয়ে পড়েছে—

Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides

কিম্বা শুনুন সেক্সপীয়রের

Cradled in the rude imperious surge—

এখানে যে কেবল উত্তাল সাগরের দোলটি ধ্বনিত হয়েছে তা নয়, তারও ওপারে কি একটা অনন্ত অসীমতার স্পর্শ আমাদের দেহে রোমাঞ্চ তুলে দেয়।

আমাদের বাংলায় এই তিনটি পর্য্যায়ের সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি। প্রথমে শুনুন কাশীরামের *

ভীম দুর্য্যোধন করে মহারণ
দেখে সবে কুতূহলে

কিম্বা হেমচন্দ্রের*

---

* কাশীরাম বা হেমচন্দ্র এর চেয়ে উচ্চস্তরের পদ যে লেখেন নাই, তা আমি বলতে চাই না। কাশীরামের

তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে

বাক্যের প্রায় দ্বিতীয় অর্থাৎ লক্ষণা-গত অর্থ ধরেছে। হেমচন্দ্রের

ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য

আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী

এখানে উক্তির উপরে অধিকন্তু কিছু নাই—সুদূর প্রসারিত রেশের টান নাই। দাঁড়ির সাথে সাথেই সবই থেমে শেষ হয়ে যায়। পরের ধাপ, ভারতচন্দ্রের

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

অথবা আরও স্পষ্টভাবে মধুসূদনের

জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে—

এখানে অধিকন্তুর আভাস পাই—কিন্তু এখানেও আভাস মাত্র। সে আভাস সে অধিকন্তু কথ্যকে, ব্যক্ত অর্থকে ছাড়িয়ে বেশি দূর যেতে পারে নাই—শব্দার্থের সাথেই জড়িত আসক্ত হয়ে আছে। শব্দকে অর্থকে বহু পিছনে ফেলে আমরা চলে যাই, ধ্বনির নিজের রাজ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হই যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের

গগনে গরজে মেঘ ঘনবরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।

কিংবা

পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ—

পড়ে থাকে দূরগত
জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত
ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে—

লক্ষণাকেও প্রায় ছাড়িয়ে গেছে।

ধ্বনি, তির্য্যকভাব, অধিকন্তু-কিছু দুটি উপায়ে লাভ করা যেতে পারে —প্রথমত, ছন্দের সহায়ে, শব্দের ঝঙ্কার মূর্চ্ছনা হিল্লোল দিয়ে। বক্তব্য কথ্যবস্তু অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ছন্দের ছাঁচে পড়ে একটি হয়ে ওঠে কাব্য তার অভাবে আর একটি থেকে যায় বাক্য। প্রাচীনতর যুগে যখন কাব্যের বিষয়টি বেশির ভাগ ছিল বস্তুতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট, সুস্পষ্ট, নিরেট, তার মধ্যে তারল্য, ধ্বনির পরিপ্লাবন, অধিকন্তু---কিছু যা তাকে আনা হত প্রধানত ছন্দের সহায়ে। এই জন্য তখন কাব্যরচনায় অলঙ্কারের (পাশ্চাত্যে, rhetoric-এর) এতখানি মর্য্যাদা ও প্রাধান্য ছিল; এবং তাই এক সম্প্রদায়ের আলঙ্কারিক বলতেন যে, রীতি অর্থাৎ বিশিষ্ট পদ রচনায় কাব্যের আত্মা। ধ্বনির দ্বিতীয় বাহনটি হল অর্থ—ধ্বনিবাদীরা অবশ্য ধ্বনির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অর্থের ধ্বনির কথাই বলেছেন, কিন্তু বস্তুত অর্থের ব্যঞ্জনা তখন যে রকমে দেখান হত বা ছিল অনেকখানি সীমাবদ্ধ। বিরুদ্ধবাদীরা তাই সহজেই বলতে পেরেছেন অর্থ ছাড়া পদের মধ্যে ধ্বনি বলে অপরূপ আলৌকিক কিছু নাই—যাকে ধ্বনি নাম দেওয়া হয় সেটিও অর্থই—গৌণ অর্থ, উহ্য অর্থ—অনুমান মাত্র।

ছন্দের ব্যঞ্জনা সামর্থ্যে একটা ক্রম আছে—তা চলেছে স্থূল হ'ত সূক্ষ্মতরের, অনির্দ্দেশ্যের অনির্ব্বচনীয়ের দিকে। এখানেও মোটামুটি তিনটি ক্রম নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথমে হল একান্ত স্থূল অতিস্পষ্ট রূপ—যার নাম অনুকার—যেমন জয়দেবের

চরণরণিতমণিনূপুরয়া

কিংবা

কোকিলকলরবকুজিতয়া

অথবা ভারতচন্দ্রের

ছলশ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা

দ্বিতীয় স্তরে এই একান্ত বাহ্য রোল বা ঝঙ্কারকে সংযত স্তিমিত করে দেওয়া হয় একটা অন্তর্মুখী মূর্চ্ছনা বা সূক্ষ্মতর রোল—যেমন কালিদাসের—

চ চাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা

কিংবা

বৈদেহী পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং
মৎ সেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্—

অথবা, রবীন্দ্রনাথের

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার

কিংবা

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা

তবে এখানেও বক্ষ্যমান বস্তুর স্থূল অঙ্গভঙ্গি, বাহ্যগতি-ধারারই অনুরূপ দোল বা রোল—প্রতিচ্ছায়া, প্রতিধ্বনি—ছন্দের তরঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখনও আমরা অনুকারের রাজ্যে রয়েছি, তবে উঠেছি তার সূক্ষ্মতর পর্দায়। এই সকলের উপরে বা গভীরে ছন্দের যে সূক্ষ্মতম পদ যেখানে বস্তুর দেহগত গতির দিকে সে ততখানি দৃষ্টি দেয় নাই—সে চেয়েছে অন্তরাত্মার চলনের কিছু আভাস দিতে—শব্দের মূর্চ্ছনার দূরতম প্রতিধ্বনি, তন্মাত্রিক রেশ দিয়ে সে ছন্দের লীলায়িত ধারা রচিত হয়েছে। কেবল স্থূল শ্রবণের গ্রহণ যোগ্য করে তার ঢেউ ধ্বনিত করা হয় নাই, তার ঢেউ পেয়েছে সেই দৈর্ঘ্য সেই উচ্চতা যাতে সে স্পর্শ করতে পারে একটা আন্তর শ্রুতি। এই যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের

For old, unhappy, far off things,
And battles long ago—

কিংবা

Or hear old Triton blow his wreathèd horn

অথবা কীট্‌সের

—Magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn—

সুরের দিক দিয়ে সেই একই অনির্ব্বচনীয়তা, একটা সূক্ষ্মতর মূর্চ্ছনার আমেজ দিয়েছে আমাদের রবীন্দ্রনাথেরই পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটী—

পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ—

ছন্দের এই যে তিনটি ধ্বনিক্রম চিত্রশিল্পের ভাষায় বলতে পারি তাদের প্রথমটি হল যেন ফটোগ্রাফ—আলোকচিত্র ; দ্বিতীয়টীর সাথে তুলনা করতে পারি পাশ্চাত্যের ক্লাসিকাল শিল্প : আর তৃতীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচ্যের শিল্প। প্রথমটি প্রত্যক্ষপ্রতিষ্ঠ, দ্বিতীয়টি কল্পনা-প্রতিষ্ঠ, তৃতীয়টি ধ্যান-প্রতিষ্ঠ।

অর্থের দিক দিয়েও তির্য্যকভাবের বা ধ্বনির অনুরূপ একটি ক্রম নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। তবে ছন্দের যে তৃতীয় পদের কথা বললাম তার মধ্যে আমরা দেখতে পারি শুধু ছন্দের নয় তার সাথে অর্থেরও তির্য্যকভাব। ফলত সুর ও অর্থ এই উভয়ের "ধ্বনি" মিলে এই স্তরের কাব্যকে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অপরূপত্ব দিয়েছে। তবুও, ছন্দ ছাড়াও কেবল অর্থের দিক দিয়ে তির্য্যকভাবের একটা বিবর্ত্তন বা ক্রমধারা, কথাটা অন্তত বুঝাবার জন্য, আমরা দেখাতে চেষ্টা করব।

প্রথম স্তর রূপক (allegory)। উপমা, উৎপ্রেক্ষা—বাস্তবিকের স্থানে তাত্ত্বিক, প্রাকৃতের স্থানে অপ্রাকৃত, জড়ের স্থানে সজীব প্রভৃতি কলাকৌশলের দ্বারা বক্তব্যবস্তুর স্পষ্টতা রূঢ়তাকে আড়াল করে দেওয়া হয়। এই যেমন স্পেনসারের

Full many mischeafs follow cruel Wrath
Abhorred Bloodshed and tumultuous Strife,
Unmanly Murder and unthrifty Scath—

এখানে ভাব ও ভাবের আচ্ছাদন যে রূপ, এরা দুটী গাঢ় সম্পৃক্ত নয় ; রূপটি ভাবের গায়ে যেন শিথিল বা আলগা হয়ে আছে, তাকে খুলে ফেলা কঠিন

নয়। কিন্তু এমনও হতে পারে, ভাব ও রূপ, অর্থ ও অর্থের মূর্তি বা চিত্র এতখানি দৃঢ়বদ্ধ ওতপ্রোত মিশ্রিত যে দুটিকে পৃথক করা যায় না—দুটি একই অনুভূতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ, এদিক আর ওদিক। তখনই উঠি দ্বিতীয় স্তরে—উদাহরণ স্পেনসরেরই

As faire Aurora in her purple pall
Out of the east the dawning call—

একে allegory বা রূপক বলা চলে না—এ হল symbolism, প্রতীক। এই প্রতীকেরও উচ্চতর স্তর আছে—আর তাই অর্থধ্বনির তৃতীয় বা পরম পদ। এখানে অর্থ ও রূপ যে সম্পৃক্ত, একীভূত, কেবল তাই নয়—এমন ভাবে ও-দুটিতে মিলে মিশে গিয়েছে যে তার ফলে উভয়ের অতিরিক্ত একটা বস্তু জন্ম পেয়েছে, কি একটা ইন্দ্রজালের প্রভাবে অভিনব জগতের, চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। এই যেমন বার্নস এর—

The white moon is settling behind the white wave
And time is settling with me--

কিংবা ব্লেকের (Blake)—

Tyger, Tyger burning bright
In the forests of the night—

অর্থগত এই ধ্বনির ক্রম আমাদের প্রাচ্যের কাব্যেও অনুসরণ করতে পারি। স্থূল রূপক হল এই—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্—

তারপর মধ্যম পদ, প্রতীকের সূত্রপাত এই—

ঊষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ

কিংবা

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

পরিশেষে, উত্তমপদ, ধ্যানের সমাধির লোকের অর্থবহ ধ্বনি

তমো আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে

কিংবা

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষনপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

ইংরাজী আর সংস্কৃত হতে এই যে অর্থগত ধ্বনির দুটি ক্রমধারা দেখালাম তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্যটি নির্দ্দেশ করবার জন্যই উদাহরণগুলি আমি এ-ভাবে গ্রহণ করেছি। প্রথম ও কতকটা দ্বিতীয় স্তর মোটের উপর এক ধরণের হলেও, তৃতীয় স্তরে একটা বৈষম্য দেখা দিয়েছে। পাশ্চাত্য কবির প্রেরণা মূলতঃ প্রাণময়, আর প্রাচ্য কবির প্রেরণা জ্ঞানময়—বৈসাদৃশ্য এখান হতেই উঠেছে। প্রাচ্য কবির অর্থ, তা যতই গূঢ় অনির্ব্বচনীয় কিছু হোক না, তা কবির চেতনায় জাগ্রত বস্তু-তন্ত্র হয়ে ফুটে উঠেছে—তাই অতিপ্রাকৃত বস্তুর কথা তাঁর হাতে প্রাকৃত বস্তুর আলেখ্যের মতই পেয়েছে একটা দৃঢ়তা নিশ্চয়তা সৌষীম্য। Mysticism বলতে আমাদের মনে যে একটা mist এর ধারণা ঘনিয়ে আসে, বাস্তবিকপক্ষে প্রাচ্যের তথা-কথিত mystic সৃষ্টিতে উর্দ্ধতর চেতনালব্ধ রূপায়নে সে রকম কিছু নাই, সেখানে বরং রয়েছে অনাবৃত দিবালোকের স্পষ্টতা, নিঃসন্দেহ জ্ঞানের স্বচ্ছতা। সুতরাং এখানে যে প্রতীক বা symbolism সেটিকে আর আচ্ছাদন বলে মনে হয় না—সেটি হয়ে উঠেছে প্রকাশক, রূপ বা রূপকের নিজস্ব অস্তিত্ব বা দ্যোতনা যেন নাই, অর্থেরই সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে। তাই এখানে অর্থের দিক দিয়ে ধ্বনির বা তীর্য্যক-ভাবের আস্বাদ এই জন্য কিছু পাই বটে যে সে অর্থ হল অধ্যাত্ম

অতীন্দ্রিয় অনির্ব্বচনীয় লোকের বস্তু—কিন্তু আসলে অন্তত সমানে সে ধ্বনি ফুটে উঠেছে এখানেও ছন্দধ্বনির সহায়ে। অন্যপক্ষে Burns-এর যে পদটী উপরে উদ্ধৃত করেছি, কিংবা পাশ্চাত্য মিসটিক কবি এ-ই'র—

—to the deep, the deep replies
And in far spaces of the soul
The oceans stir, the heavens roll—

এখানে কবি চলেছেন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিকে ভর করে নয় কিন্তু অনুভবের স্পর্শালুতার গৌণতাকে ধরে—এখানে অনুভবের বস্তুটি কেমন দূরের রহস্যময়ের মধ্যে রয়েছে, কবি তাকে কি একটা সূক্ষ্ম সংযোগ-সূত্রের সহায়ে স্পর্শ করেছেন অথবা কেমন স্বপ্নের আবেশে তার কাছে গিয়ে পড়েছেন। প্রাচ্যের ঋষি কবি যেখানে কেবলই বলছেন সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে, জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে, সেখানে পাশ্চাত্যের ঋষি বলবেন (A.E.)

Our hearts were drunk with a beauty
Our eyes could never see.

এখানে যে ধ্বনি বা তির্য্যকব্যঞ্জনা তা সাক্ষাৎভাবে অর্থেরই অবদান। এই অর্থগত ধ্বনিকে জোর দেবার জন্য, পরিস্ফুট করে ধরবার জন্য অবশ্য এখানে ছন্দের ও ধ্বনিগত মূর্চ্ছনাকে আশ্রয় করা হয়েছে। তবে প্রকৃত-পক্ষে, পূর্ব্বেই বলেছি, শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির মধ্যে, কবিত্বের উত্তম পদে ও-দুটি অঙ্গ পৃথক করা যায় না।

অর্থগত ধ্বনির ক্রমে, আর এক প্রকার একটু বৈসাদৃশ্য আমাদের বাংলা কাব্যের সহায়ে আমি দেখাব এবার। প্রথম স্তরটিতে বিশেষ পার্থক্য নাই—রূপকের সহায়ে তির্য্যক ভাব এই—যথা চণ্ডীদাসে

শ্রীরাধিকা হবে রাজা হইব তাহার প্রজা
ডুবিব রসের সরোবরে
সেই সরোবরে গিয়া মনপদ্ম প্রকাশিয়া
হংস প্রায় হইয়া রহিব—

এই রূপক কিন্তু এমনভাবে ব্যবহার করা যায় যে বাস্তবিকই ত অর্থের আচ্ছাদন নয়, আবরণ হয়ে পড়ে—অর্থকে গুপ্ত গুহ্য রাখার জন্যই রূপকের ব্যবহার হয়। Nostradamus-এর ভবিষ্যবাণী, Book of Revelation-এর রূপক হেঁয়ালীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বৌদ্ধ দোঁহার "সন্ধ্যা-ভাষায়" তার প্রতিরূপ পাই। কিংবা ধরুন রাগাত্মিকা পদের এই—

প্রথম দুয়ারে মদের গতি
দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়—

এর অর্থ জানে এক ঐ পথের সাধকেরা—এর নাম hermetic কবিতা কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ-ধরণের সূত্র বা মন্ত্র কাব্য নয়—এখানে যে তির্য্যক-ভাব তা কাব্যগত ধ্বনি নয়, তা বিরাটের অনির্দ্দেশ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায় না—তাতে নিয়ে যায় যেন একটা চোরাগলির অন্ধকারের মধ্যে—আমি বলছি কাব্যের দিক দিয়ে, সাধনার দিক দিয়ে নয়। এখানকার লক্ষ্য obliquity (তির্য্যক প্রকাশ) নয়, এখানকার লক্ষ্য obscurity (অপ্রকাশ)। তবে চণ্ডীদাসের হাতে চোরাগলিও সময়ে সময়ে কেমন প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে ওঠে। এই দেখুন গূঢ়ার্থ বা হেঁয়ালিকে, আমরা যার নাম দিয়েছি প্রতীকাত্মক বা মধ্যম পদের কাব্য সেই স্তরে কেমন তুলে ধরেছেন—

এ দেহে সে দেহে একই রূপ
তবে সে জানিবে রসেরই কূপ—

এমন কি আরও দূরে চলে গিয়েছেন, সে হেঁয়ালীকে একেবারে উত্তম পদেই নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—

কুলের উপরে কুলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ
ঢেউয়ের উপরে ঢেউয়ের বসতি
ইহা জানে কেউ কেউ—

বুদ্ধি এখানে স্পষ্ট অর্থ কিছু ধরতে পারে না—তবু এখানে গভীরতর অর্থের ধ্বনি পাই—এখানেও সে অর্থকে ছন্দেরও একটা ধ্বনি পরিপুষ্ট প্রতিরণিত করে তুলেছে।

এই ধরণের যে বক্রতা—হেঁয়ালির, ধাঁধাঁর, "সিন্দুরবিন্দুর্বিধবা-ললাটের"র বক্রতা—বাস্তবিকপক্ষে খাঁটি তির্য্যকভাব বা ধ্বনি নয়। কারণ এ বক্রতা হল কেবল পরিভাষার কথা। নূতন একটা ভাষায় যে অবোধ্যতা এখানেও রয়েছে সেই অবোধ্যতা। শব্দের, সংজ্ঞার আভিধানিক অর্থ আয়ত্ত হলেই বাক্যের অর্থ জলের মত স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থেরই মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধির অতিরিক্ত রহস্য কিছু নাই—অনির্দ্দেশ্য অস্পষ্ট কিছুর প্রতি ইঙ্গিত নাই।

তবে একটি কথা, এই ধারার কাব্য সত্যকার কাব্য বলে আপনাকে প্রচার করে নাই, সত্যকার কাব্যের মর্য্যাদা দাবি করে বসে নাই। এগুলি হল কাব্যজগতের আশে-পাশের সৌখীন সৃষ্টি, উদ্বর্ত্ত—bye products

কিন্তু এই "উদ্ভট"-কাব্য ছাড়াও কাব্যের প্রশস্ত পাকা রাস্তাতেই আর এক রকম বক্রতার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়—যার নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যাসকূট। অর্থকে ঢেকে রাখবার জন্য, তার চারিদিকে একটা কুহেলিকা প্রহেলিকা অর্থাৎ ধ্বনির আবহাওয়া সৃষ্টি করবার জন্য কবিরা বাক্যের গঠনে এনে দেন একটা বিপর্য্যয় অর্থাৎ তার অঙ্গ সব দেন কেটে ছেঁটে, ভেঙ্গে মুচড়ে, ওলটপালট করে। ব্রাউনিংএর শেষ যুগের লেখা এই জন্যে হেঁয়ালি হয়ে উঠেছে—অর্থের গাঢ়তায় গভীরতার জটিলতার দিক দিয়ে যে সে কবিতা দুর্ব্বোধ তা নয়, দুর্ব্বোধ্যতার কারণ পদবিন্যাসের অন্বয়ের দুষ্করতা। Hopkins এ-বিষয়ে বোধ হয় অতিমাত্রায় পৌছেছেন। তিনি "brimful in flash"এর পরিবর্ত্তে "brim, in a flash, full" লিখেই সন্তুষ্ট হন নাই (বোধ হয় জর্ম্মন পদগঠনের অনুকরণে), "through the other" কথাটিকে সংহত করে বলেছেন "throughter"! কাব্যের

আত্মা ধ্বনির সন্ধানে Hopkins ভাষাকে ছন্দকে নিয়ে যে কি উৎকট হঠ-যোগ সাধন করেছেন তা বিচিত্র বিস্ময়কর। ফরাসীভাষায় Mallarméও ঐ রকম কিছু করতে প্রয়াস করেছেন। ফরাসী ভাষায় যে সহজ অনাবিল স্বচ্ছতা তার মধ্য দিয়ে অনির্দ্দেশ্যের ধ্বনি ফুটিয়ে তোলা সুকঠিন বলেই তিনি ঐ কৃচ্ছ্রতপস্যার পথ ধরেছিলেন। কিন্তু তবুও মনে হয় আধ্যাত্মিক জগতে সহজ সাধনাই নিয়ে যায় সত্যে, কাব্য জগতেও সহজই নিয়ে যায় সুন্দরে।

যুগে যুগে—কবি হতে কবি—কাব্যের আত্মা এই ধ্বনিকে প্রকাশ করবার জন্য কত না রকমারি উপায়, কৌশল অবলম্বন করেছে। আধুনিক যুগ যে ভঙ্গী ধরেছে তা একান্ত অভিনব অভাবনীয় তুলনাহীন—আধুনিকের বিশ্বাস এতদিন পরে এবার জগতে সত্যকার কবিতা, শ্রেষ্ঠতম কবিতা যথার্থতঃ সৃষ্টি হতে চলেছে, কবিতা দেবীর এবার পুরাপুরি নবজন্ম—রূপান্তর।

ছন্দকে বাক্যবন্ধকে এ যাবৎ মনে করা হত কবিতার কাঠামো, দেহ, বাহন, প্রকাশ যন্ত্র বলে। কিন্তু আজকাল তাকে বিবেচনা করা হয় বন্ধন অন্তরায় হিসাবে। রচনার গড়নের যে রীতি নীতি—বাঁধন ছাঁদন—তা ভেঙ্গে ছিঁড়ে কেটে দেওয়া হয়েছে—সেখানে আনা হয়েছে বন্ধনহীনতা, মুক্তি, স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাগতি। এমন কি গদ্যের বাঁধনে পর্য্যন্ত কাব্য আর বন্দী হতে চায় না—আরো উন্মুক্ত অবকাশ সে চেয়েছে। এক জাতীয় রাষ্ট্রনীতি যেমন বলে যে সকল রকম শাসনই হল সুশাসনের অন্তরায়—শাসনের অভাব ও একান্ত অভাব অর্থাৎ অ-শাসনই পরম সুশাসন, শিল্পক্ষেত্রের আধুনিকেরা এই ধরণের এক কালাপাহাড়ী নীতি অনুসরণ করেন।

আধুনিকেরা যে আমূল পরিবর্ত্তন বা বিপর্য্যয় আনতে চেয়েছেন তা কাব্যের মূল ধরেই টান দিয়েছে। তা ছন্দোগত ত বটেই, বিশেষভাবে বস্তুগত। প্রাচীনদের যে ছন্দোগত ধ্বনি তা সূক্ষ্ম ধরণের, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র—আধুনিকের শ্রবণে ও-জিনিষ যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে নাই। ছন্দের

ধ্বনিকে নবীনেরা আমোল দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁরা ছন্দেরই যে বিসর্জ্জন দিয়েছেন—তাঁরা চেয়েছেন টেলিগ্রাফী ভাষার চলন—প্লুতগতি অর্থাৎ উল্লম্ফন। বস্তুকে অর্থকে তাঁরা একেবারে ঢেলে সাজতে চেয়েছেন। প্রাচীনেরা যত রকমে অর্থকে ধরে তির্য্যকভাব ফুটিয়ে তুলেছেন, ছন্দের মত তাতেও আধুনিকের কবি-চেতনা তৃপ্তি পায় নাই। সে অর্থের, তার বিষয়বস্তুর দিয়েছে একটা নূতন গড়ন, ঘটিয়েছে সেখানে ওলট-পালট। কেবল কাঠামোর মধ্যে নয়, ভিতরের বস্তুর সারাংশের মধ্যে বিপ্লব বিপর্য্যয় কি জিনিষ? ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই—উদাহরণেরই পরিচয়। ১৯৩৫ সালের * এক কবি বলেছেন শুনুন—

The God approached dissolves into the air
Magnolias, for instance, when in bud,
Are right in doing anything they can think of ;
Free by predestination in the blood,
Saved by their own sap, shed for themselves,
Their texture can impose their architecture ;
Their sapient matter is already informed.

যে মূল কথাটি কবি এখানে বলেছেন তত্ত্ব হলেও তা হেঁয়ালি নয়—তবে হেঁয়ালির কাছাকাছি টেনে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। শ্লেষে ব্যাঙ্গে গুলিয়ে নস্যাৎ করে দিয়ে চলেছেন পুরুষকার দেবতাটিকে। এর জন্য তিনি আশ্রয় করেছেন কতখানি পরাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরিক বিদ্যাবত্তা। অর্থকে এই রকমে নানাদিক থেকে যুগপৎ প্রতিফলিত করে তাকে প্রতিধ্বনিত করে তুলতে চেয়েছেন। ছন্দোগত প্রতিধ্বনি তিনি চান নাই—কারণ ছন্দের দোল হল প্রাণের হৃদয়ের অনুভবের দোল, আর এ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আধুনিকেরা সযত্নে পরিহার করতে চেয়েছেন।

* The Year's Poetry—1935

তাঁদের কারিগরি হল মস্তিষ্কের কাঠখোট্টা কাঠামে ফেলে কবিতার রূপটি গড়ে তোলা।

আরও পরিষ্কার হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁর মধ্যে নিয়ে যেতে আধুনিকেরা যে কসুর করেছেন তা নয়—শুনুন আর একজন ৩৫ সালের কবির কথা—

Twining of serpents ! Halitosis of lions
be backward from the body,
Be speed from the wind and lightness in the air,
following no sandy path from Italy
but moth-swift, palpitating, where
by wind's plume silver splashed
the untroubling negro water
Strives with the light, O' Whitely blades—

বুঝলেন কিছু ? এটি মোটেও তত্ত্বকথা নয়—এটি হল সমুদ্রযাত্রার ছবি !!

এই পথেই বুঝি সে নিয়েছে আধুনিক যুগের একটা অপরূপ বক্রতা—এটিও প্রধানতঃ অর্থগত। এতে কাব্যের—শুধু কাব্যের কেন সাধারণ ভাবে সকল শিল্পের একটা অদ্ভুত—বিকট বললেও অত্যুক্তি হবে না—ধারা সৃষ্টি করেছে। তার নাম surrealism—"পরাবাস্তবতা"। এর জন্মের ইতিহাস এই। শিল্পী দেখলেন জগতের, মানবজীবনের মোটামুটি কথাগুলি পূর্ব্বতন শিল্পীরা সবই বলে ফেলেছেন, শুধু তাই নয় একই কথা পুনঃপুনরুক্ত হয়েছে যুগে যুগে দেশে। স্পষ্ট ব্যক্ত সর্ব্বজনসুলভ অনুভব উপলব্ধির মধ্যে নবীন শিল্পী চমৎকারিত্ব কিছু আর দেখলেন না। তিনি খুঁজতে বের হলেন তাই অসামান্য অসাধারণ লোকবহির্ভূত কিছু। তাঁর ভিতরের কবিপ্রাণ চায় "ধ্বনিকে"—অধিকন্তু-কিছুকে, সুদূরকে; এই সুদূর, অধিকন্তু-কিছু বা ধ্বনিকে চিরাচরিত সনাতন কথাবস্তুর মধ্যে—মানুষের ব্যক্ত চেতনার বিষয় গণ্ডীতে—তিনি আর কোন মতে ধরতে

পারেন না। এমন কি, এই সব পরিচিত পুরাতন কথা-কাহিনীকে ছন্দের রোল দিয়ে দোল দিয়ে যতই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ধরবার চেষ্টা করা যাক না —বাস্তবিক পক্ষে তা সত্যকার অধিকন্তু-কিছু হয়ে দাঁড়ায় না। তাই আধুনিকেরা চাইলেন সম্পূর্ণ নূতন জগৎ অধিকার করতে—শিল্পীকে বললেন জাগ্রত ছেড়ে স্বপ্নের লোকে উঠে আসতে—স্বপ্ন অর্থ কল্পনা নয়, বাস্তবিক সুপ্তিগত স্বপ্নকে তাঁরা শরীরী করতে চাইলেন। সম্মুখের জগৎ নয়, পিছনের জগৎ, ব্যক্ত চেতনা নয় অব্যক্ত অবচেতনা হল তার কাব্যলোক —পূর্ণ বাস্তব বা আসল অখণ্ড সত্য একই সমতলে সরলভাবে প্রসারিত নয়—তা হল বহুতল-সমন্বিত। কাব্যসৃষ্টিতেও প্রতিবিম্বিত হবে এই বহুতলের সংমিশ্রণ। কাব্যের তির্য্যক ভাব এ ধারায় পেয়েছে একটা বক্রতা—মূল প্রেরণা হয়ত ছিল বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত কিন্তু কার্য্যত ক্রমে সে বক্রতা অর্থ হয়েছে কৌটিল্য অর্থাৎ বিকৃতি। ধ্বনির, মার্গাতিরিক্ত কিছুর অন্বেষণে গিয়ে আমরা এসে পড়েছি এখানেও এক চোরাগলির মধ্যে। প্রাচীনের "মেলডি" ছেড়ে চেয়েছিলাম বুঝি "সিম্ফনি"—কিন্তু গড়ে তুলেছি বিস্তারিত কলরব—সহজ ভাষায় এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে প্রলাপ। আপনারা মনে করতে পারেন আমার এ হল অতিশয়োক্তি—আদৌ না, না দেখলে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না আধুনিক কবিরা কত নিরঙ্কুশ। শুনুন একটু নমুনা—

> A kick in the pant once more
> and the empty sardine-tin thinks itself holy
> A kick with the heel on the jaw
> and it is a divinity
> which swims in pure honey
> not caring about protozoons
> sea-horses

or heavenly pebbles that flatter from eye to eye
and carry reason
with a little sauce and some broken teeth
into the society of cabbage…stumps…

এই বোধ হয় যথেষ্ট। এ কবিতা স্বয়ম্প্রকাশ, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন—

ঠিক এ ধরণের কিছু বাংলা সাহিত্যে এখনও আবির্ভূত হয় নাই। আমরা বোধ হয় কথঞ্চিৎ পিছনে পড়ে আছি। আমাদের অতি-আধুনিকেরা প্রাণের সহজ সরসতা, গভীর ঐকান্তিকতাকে বাদ দিয়ে মস্তিষ্কে স্থিতিলাভ করতে অনেকখানি পেরেছেন বটে; কিন্তু পুরোপুরি উদ্ভট হয়ে যেতে পারেন নাই। তবে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, কয়েকটা কৌশল বা প্যাঁচ আয়ত্ত করেছেন ইতিমধ্যে এবং আশায় আছেন—শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।

পরাবস্তুতন্ত্রীরা চেয়েছেন বহুল বিবিধ অর্থের—নানা জগতের নানা ক্ষেত্রের, নানা চেতনার ও অনুভবের—সংমিশ্রণ ও যুগপৎ প্রকাশ। একটির পর একটি করে চিন্তার অনুভবের তানবিস্তার—একটি ধারাকে শেষ করে তবে আর একটির আরম্ভ—একসময়ে চোভয়ানবধারণম্—এই হল প্রাচীন পদ্ধতি। আধুনিক চায় বহুর বিচিত্রের বিপরীতের বিরোধীর সমবায়, বৃহৎ জটিল কলধ্বনি; তার লক্ষ্য বা তার পরিণাম, অর্থ বিশেষ স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলা নয়, কিন্তু নানা অর্থের আল্পনা, একটা প্যাটার্ণ—জ্যামিতিক প্যাটার্ণ—সৃষ্টি করা। ছন্দের দিক দিয়েও সে চায় সুর নয়—সুর ত সস্তা মেয়েলী জিনিষ—এই রকমেরই গতির প্যাটার্ণ (অনেক সময়ে স্থূলভাবে লাইনগুলিকে ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের করে সাজিয়ে এই প্যাটার্ণের ইঙ্গিত দেওয়া হয় যথা, E. E. Cummings)। ধ্বনিসৃষ্টির একটী উপায় হল, কথায় ভাবে ফাঁক রেখে রেখে চলা—এই ফাঁকই কল্পনার ব্যঞ্জনার অবসর করে দেয় (এরই সুপ্রাচীন নাম "লক্ষণা")।

আধুনিক যুগে এই ফাঁককে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করে দেওয়া হয়—ফাঁকের পরিবর্ত্তে তাই দেখা দিয়েছে গহ্বর—এবং গহ্বরের উভয় পারের মধ্যে কোন মিল বা সারূপ্য নাই। আগে ফাঁক ছিল যতি মাত্র, পৃথক অথচ সদৃশ জিনিষের সংযোগ সেতু। কিন্তু এখন—আচ্ছা একটু নমুনা তবে শুনুন—

গরাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি
কি দুর্ব্বল ভঙ্গিমাটি তার—
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে
নীচু হয়ে সমতলে বাঁধে—

কবির বলার উদ্দেশ্য "নাই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে"—অর্থাৎ জংলী বাঘটা বন্দী, তাই নিশ্চিন্তে তুমি ওর সামনে জুতোর ফিতে বাঁধছ, কিন্তু—আহা, কি ট্রাজেডি!

প্রথম কথা, অর্থকে বাক্যকে উহ্য করে রাখলেই যদি কাব্য গড়ে ওঠে তবে বেদান্ত সূত্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য জগতে আর নাই (এক তান্ত্রিকের মন্ত্র হ্রীং ক্লিং ছাড়া হয়ত)। তার পর কথায় বা চলনে এখানে যাদু কই? ছন্দের সুরের রেশ ধ্বনি যে সুদূরের দিকে নিয়ে চলে—কোথায় সে অনির্ব্বচনীয়তা সে ইন্দ্রজাল, সে ম্যাজিক?

সাক্ষাৎভাবে, স্থূলভাবে বাক্যের মধ্যে অর্থের মধ্যে ফাঁক—গহ্বরই—রেখে রেখে ধ্বনির প্রকাশ জাপানী কবিতার বিশেষত্ব—তা হতে পারে, জাপানের ভাষায় এ ধারা নিশ্চয় একান্ত সরল সহজ স্বতস্ফূর্ত্ত। তার অনুকরণে বাংলায় যখন বলি—

শীতল স্থির আকাশ
গ্যাস নিবে গেছে
জাগে নি কো কাক
বাতাস—পচু

শুধু কাঁপে তার শুধু বাজে শ্বেত বক্ষ তার—

তখন আমাদের রসপিপাসু হৃদয় কতখানি বেজে ওঠে, কতখানি কি ভাবে কাঁপে? শুনুন দেখি এর পরে পুরাতন কবিকে আবার একটু—

The winds come to me from the fields of sleep

অথবা, আমাদের রবীন্দ্রনাথের সেই অতিপরিচিত—

ওপারের কালো কূলে   কালী ঘনাইয়া তুলে
নিশার কালিমা,
গাঢ় সে তিমির তলে   চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা—

পার্থক্য কোথায়? একটিতে রয়েছে গদ্যের আবহাওয়া, আর একটিতে কাব্যের সুরভি—একটির মূলে কৌতূহল আর একটির তন্ময়তা।

কাব্যে টেলেগ্রাফী ভঙ্গীর স্থান থাকতে পারে, সম্পূর্ণ বিসদৃশ বিজাতীয় উপকরণ (incomensurables) এক পাটায় বাটা যেতে পারে, মহান্ (sublime) ও তুচ্ছকে (ridiculous) একই জোয়ালে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে হয়ত—কিন্তু সে জন্য চাই একটা অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি। শেক্সপীয়রের এ ক্ষমতা ছিল—বাল্মীকির এ ক্ষমতা ছিল (কুব্জার কুঁজও যিনি grand style এ বর্ণনা করেছেন)। আধুনিকের প্রতিষ্ঠা একদিকে রূঢ় তর্কবুদ্ধি, অন্যদিক স্থূল অমার্জ্জিত ইন্দ্রিয় অনুভব—কিন্তু এ-দুটিকে রূপান্তরিত করে তুলতে পারে যে তৃতীয় শক্তি, এক গাঢ়তর চেতনা তাকে ত পাই না।

কাব্যের কবিত্ব,—কাব্যের প্রাণ, ধ্বনি মূলতঃ এই গাঢ়তর চেতনার শ্রী ব্যতীত আর কি? এ হল চেতনার সম্প্রসারণ ও ঊর্দ্ধায়নের ফল। কবিচেতনা, সত্যকার কবিচেতনা সহজ চেতনা হতে ভিন্ন স্তরের ভিন্ন দরের জিনিব। সাধারণ চেতনার সঙ্কীর্ণতা ও অগভীরতা অতিক্রম করে কবি-চেতনা পেয়েছে একটা বিস্তীর্ণতা ও অতলতা—সাধারণ বস্তুও তিনি যখন

দেখেন, তা দেখেন এই বিস্তীর্ণতা ও অতলতার ভিতর দিয়ে, সুতরাং ঐ বিস্তীর্ণতা ও অতলতাই সকল জিনিষের চারপাশে তার আবহাওয়ার মত তাকে ঘিরে থাকে—এরই নাম হল ধ্বনি।

কবি মালার্মে

কিছুদিন পূর্ব্বে আপনি ফরাসী কবি মালার্মে (Mallarmé) সম্বন্ধে একটু টিপ্পনী করেছিলেন*। আমার মনে হয়েছিল আপনার হাতে বেচারী কবির ঠিক সুবিচার হয় নাই। অবশ্য আপনি বলেছিলেন আপনার মতামতের মালমশলা হল সমালোচকদের সিদ্ধান্ত—কবির মূল রচনার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ আপনার ঘটে নাই।

প্রথম কথা, ইংরেজের পক্ষে ফরাসী কাব্যের সম্যক রসগ্রহণ সাধারণতঃ একটু দুরূহ। ফরাসী কবিত্বের ধরণ-ধারণ ইংরেজী কাব্য প্রতিভা হতে এত বিভিন্ন যে ম্যাথু আর্ণল্ডের মত বেশির ভাগ ইংরেজেরই ফরাসী কবিতা প্রাণে সাড়া তোলে না (leaves them cold)। অনেকে অজ্ঞাতসারেই মাতব্বরী চালে ফরাসীর কবিতা সম্বন্ধে রায় দিয়ে থাকে—কারণ তাদের এই ধারণা যে ইংরেজী কাব্যের তুলনায় ফরাসীর কাব্য হল গদ্যেরই নামান্তর মাত্র। এ ক্ষেত্রে ইংরেজ সমালোচককে মধ্যস্থ বা বিচারক হিসাবে গ্রহণ করায় অনেক বিপদ। তবুও মালার্মের অনুবাদক স্যর রজার ফ্রাই (Sir Roger Fry) এই ফরাসী কবিকে বুঝতে ও বুঝাতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন এবং তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। Fry-এর অনুবাদ আদর্শ অনুবাদ নয় —কোন অনুবাদই তা হয় না। তিনি মালার্মের রচনারীতি—যথা, ক্লিষ্ট-অন্বয় অনুবাদেও অনুকরণ করেছেন, কিন্তু মনে হয় ভিতরের ভাব অনেকখানি ফিকে হয়ে গিয়েছে, সূক্ষ্ম অনুরণন বেশির ভাগ মুছে গিয়েছে।

ফরাসীরা মালার্মেকে তাদের একজন শ্রেষ্ঠ, একেবারে প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লেই বিবেচনা করে—minor poet তাদের কাছে তিনি আদৌ নন। ইংরেজ তার শেলী, কীট্‌স্ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে যে চোখে দেখে,

---

* "ছন্দা" সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে লিখিত

মালার্মেকেও তার কিছু কমে ফরাসী দেখে না। সারা ফরাসী দেশ তাঁকে Maître (অনেকটা আমাদের "গুরু") ব'লে বরণ করে নিয়েছে—ফরাসী কাব্যজগতে তাঁর প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে—তিনি ব্যতিরেকে ফরাসী কাব্য আজ যা তা সে হয়ে উঠতে পারত না।

মালার্মে অর্থ ফরাসী কাব্যে একটা যুগান্তর। ফরাসী কবিত্বের যেটি ত্রুটি লক্ষ্য করা যেতে পারে এবং যার জন্যেই মূলতঃ ফরাসী কাব্যের উপর ইংরাজের অনুরাগ সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় না, সেটি লাতিন প্রকৃতির একটি গুণ হতে উদ্ভূত। লাতিনের মন পরিষ্কার এবং পরিচ্ছিন্ন, বুদ্ধিশাণিত যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত এবং সীমানির্দ্দিষ্ট। ইউরোপের উত্তরাপথে টিউটন জাতি (এবং শ্লাভ জাতিও) স্বভাবতঃ সুদূর-আদর্শপরায়ণ, তার মনে প্রাণে রয়েছে একটা ইন্দ্রিয়-মনের ওপারের দিকে গতি ও এষণা,—তার দেশের আবহাওয়ার মত তার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে অতন্ত্রের, তাত্ত্বিকতার কুয়াসা পক্ষান্তরে ইউরোপের দক্ষিণাপথে, লাতিনের মনবুদ্ধিতে প্রতিফলিত ভূমধ্য-সাগর বেলার সুনির্ম্মল আকাশ, সুস্পষ্ট সুষম রেখালাস্য। ফরাসী কাব্য বুদ্ধির কাঠামে গ্রথিত—ভাব, অর্থ, ভাষা স্বচ্ছ সুশৃঙ্খল—চলন-বলন নিটোল-সুডোল। সেখানে পরাবৃত্তের উন্মার্গগামী টান নাই, অর্থাৎ নাই হেঁয়ালী, লোকোত্তর ইন্দ্রজাল, অশরীরী অনির্ব্বচনীয়তা, দূর ওপারের প্রতি ইঙ্গিত।—শেক্সপীয়রের

> Daffodils..
>
> That come before the swallow dares and take
>
> The wins of March with beauty

এখানে রয়েছে যে অপরূপ যাদু, ফরাসী কাব্যের ধাতে তা ফোটে না।

অবশ্য একটা কিছু অনির্ব্বচনীয়তা ছাড়া কাব্য আদৌ হয় না। ফরাসীর সুষম মন, যুক্তিপ্রধান বুদ্ধিকে ধরে বা তার মধ্যে বা তা সত্ত্বেও ফরাসী কবি সেই অনির্ব্বচনীয়তা আনতে চেয়েছে—যুগে যুগে প্রত্যক কবি

নিজের নিজের ভাবে সে কাজটি করেছেন। রঁসার হ'তে হিউগো সকলে ফরাসী প্রকৃতির এ ত্রুটি সেরে নেবার নিজস্ব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে।

কিন্তু মালার্মের বিশেষত্ব, এদিক দিয়ে ফরাসীতে তিনি একটা বিপর্য্যয়, বিপ্লব—রাষ্ট্রে ও সমাজে ফরাসী বিপ্লবেরই মত—এনে ফেলেছেন। মোটের উপর Impressionist বা Symbolistদের এই কাজই ছিল। কাব্যে মালার্মের সঙ্গে ছিলেন ভেরলেন—চিত্রে উল্লেখ করা যায় মোনে (Monet) ও সেজান (Cézanne)। এ চেষ্টার অর্থ শিল্পকে অর্থপ্রতিষ্ঠ না করে ধ্বনিপ্রতিষ্ঠ করা,—ফরাসী শিল্পপ্রতিভার প্রতিষ্ঠাটিই পরিবর্ত্তন করে ফেলা। মালার্মে ইংলণ্ডে কিছুদিন ছিলেন এবং নিজের দেশে ইংরাজী ভাষার শিক্ষকতা করতেন—তিনি চেয়েছিলেন ইংরাজের কাব্যের মতই ফরাসী কাব্য হয়ে উঠুক ইঙ্গিতময়, রহস্যপ্রধান, অনির্ব্বচনীয়-অতলতা-গর্ভ।

ভেরলেন ও-বস্তুটি কাব্যে এনে দিয়েছেন গানের, তানের, সুরের, মূর্চ্ছনার লাস্যের থরস্রোতের জোরে; ভাষায় ছন্দে—এবং ফলে, ভাবে —তিনি এমন একটা সূক্ষ্ম তীব্র আলাপনের মীড় টেনে চলেছেন যে আমরা তাকে ধরে উধাও হয়ে চলে যাই যেন কোন অজানা অন্তরীক্ষে। মালার্মে অনুসরণ করেছেন ভিন্ন এক পদ্ধতি। তিনি ভাষাকে ব্যবহার করেছেন ভাস্কর হিসাবে—এদিক দিয়ে তিনি বোদেলের (Baudelaire)-কে অনুসরণ করেছেন। ভাষার ভিতরে যদি কোথাও ফাঁক থেকে থাকে—জল, বায়ুর অবকাশ থেকে থাকে—সে সব তিনি টিপে, চেপে, ঠেসে বন্ধ করে দিয়েছেন; নরম যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তাকে পিটিয়ে গাঢ় শক্ত করে তুলেছেন—তাঁর উপকরণ নিরেট জমাট যেন পাথর। সেই একই উদ্দেশ্যে মনে হয় যেন তিনি সোজাকে উল্টে দিয়েছেন, সহজগ্রাহ্যকে দুর্গ্রাহ্য করে ধরেছেন। ভাস্করের ঠিক আনন্দই হল এখানে, এমন যে অসার কঠিন পদার্থ তা থেকে এক রমণীয় কমনীয় মূর্ত্তি প্রকট করে তোলা— মালার্মেও যেন চেয়েছিলেন কাঠিন্য কঠোরতাকেই আশ্রয় করে, (Memnon)

মূর্ত্তির মত, অপূর্ব্ব সঙ্গীত ছন্দিত করে তুলতে। উপকরণ যত অনমনীয়, দুর্ব্যবহার্য্য, বিদ্রোহী হয়, তাকে বশীভূত করে, তার ভিতর দিয়ে আপন মানসমূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করবার উল্লাসও শিল্পীর তত বেশি। তরল রঙে, কোমল তুলিতে স্বপ্নকে হয়ত সহজে ফলিয়ে ধরা যায়, অশরীরী ধ্বনির মধ্যে সুদূরের সুন্দরের রূপ দেওয়া হয়ত আরও সহজ। কিন্তু পাথর আর এক ধরণের বস্তু—মালার্মের ভাষা প্রস্তরোপম এবং তাঁর কবিতা এক-একটি প্রস্তর মূর্ত্তি বা ইমারত।

বাক্যবিন্যাসের দুর্ব্বোধ্যতা মালার্মের বিরুদ্ধে এক প্রধান অভিযোগ। এই দুর্ব্বোধ্যতা তাঁর যে সঙ্কল্পকৃত—ব্যাসকূটের মত পাঠককে বিভ্রান্ত করবার জন্য—তা ঠিক বলা চলে না। এটি তাঁর ভাস্করসুলভ মানসগঠনের বাহ্যপ্রতিরূপ মাত্র। এ পদ্ধতিটি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল, ফরাসী ভাষার অতিমাত্র স্বচ্ছতার যুক্তিপরতার প্রতিষেধ হিসাবে শুধু নয়—ধ্বনিময় লোকোত্তর সত্যসৃষ্টির নিজস্ব প্রয়োজনেও বটে। সকল কাব্যসৃষ্টি একটা বোধন, evocation, অর্থাৎ কোন অনুভব উপলব্ধি দর্শনকে বাক্যের সহায়ে অবয়বী করে তোলা। মালার্মের কবিদৃষ্টিতে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, প্রকাশের সময়ে তিনি তার পূর্ণ যথাযথ সর্ব্বাঙ্গবিষদ প্রতিকৃতি এঁকে তুলতেন না। ধ্যানদৃষ্ট ছবির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন—কিন্তু অর্থগর্ভ—অঙ্গ, কয়েকটি সু-উচ্চ চূড়া যেন—তিনি ব্যক্ত করে ধরতেন ; এ অঙ্গগুলির সম্বন্ধ ও সংযোগ আবিষ্কার করে, উহ্য অন্তর্হিত অংশগুলি পূরণ করে সমগ্র চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হল পাঠকের কল্পনাশক্তির, সহানুভূতির, রসজ্ঞতার কাজ। শুধু তাই নয়, এই বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলিও প্রায়ই তিনি সোজাসুজি সামনে ধরে দেন না—দেন তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে, তারা স্মরণ করিয়ে দেয় তাদের সাথে কোনরকমে সংশ্লিষ্ট অন্য জিনিষ সব—এরাই হয় মুখ্য উক্ত, আর আসল যা তা হয় গৌণ উহ্য।

এই রকম অর্দ্ধোক্তি, ইঙ্গিতময়তা, সঙ্কেতসর্ব্বস্বতা ছাড়াও মালার্মে যে সহজবোধ্য নয় তার অন্য কারণ আছে। তাঁর অনুভূতি সত্যসত্যই অনেক সময়ে এ জগতের কিছু নয়, স্থূল হতে ইন্দ্রিয়ের আয়তন হতে তিনি যা গ্রহণ করেছেন তা উপকরণ অবলম্বন মাত্র—লৌকিক তাঁর হাতে অলৌকিকের—আধ্যাত্মেরই—পৈঠা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির মধ্যে উঠে না যেতে পারলে তাঁর কাব্যকে মনে হবে ধাঁধাঁ হেঁয়ালী প্রহেলিকা।

কবির এতখানি কঠোরতা দুর্ব্বোধ্যতা তবুও কিন্তু ফরাসীর কবি-চিত্তকে বিমুখ করতে পারে নাই। কারণ অর্থ ছাড়া, এমন কি ভাব ছাড়াও, তাঁর মধ্যে রয়েছে কথার বাক্যের ছন্দের সহায়ে অপরূপ সুরের আলপনা, রংএর খেলা, রয়েছে আমরা যাকে বলি "আলগা শ্রী", একটা উপরন্তু লাবণ্য যা ফরাসী সাধারণের পক্ষে সুলভ ও সহজগ্রাহ্য। এই দিক দিয়েই—আর একেই কি সত্যকার কবিত্ব বলে না?—মালার্মে ফরাসীর মনপ্রাণ এত সহজে হরণ করেছেন। বিদেশীরা বেশির ভাগই হয়ত ও-রসে বঞ্চিত, তাদের ভাগ্যে রয়েছে নারিকেলের ছোবড়া ও খোলা।

তবে মালার্মে যে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্রই কঠোর দুর্ব্বোধ্য তা নয়। তিনি খুবই সুবোধ্য—আর কি সুন্দর—হতে জানেন। এই ধরুন না—ফুলের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন

Vermeil comme le pur orteil du seraphin
Que rougit la pudeur des aurores foulées—

ঊষার উপর দিয়ে, ঊষার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে দেবতা। দেবতার চরণস্পর্শে ঊষা লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। সেই রক্তিমায় রঞ্জিত দেবতার অমল পদাঙ্গুলি। ফুলটি হল এই রঞ্জিত অঙ্গুলির মত সিন্দুরবর্ণ।*

* আর একটু মূলানুগত করবার চেষ্টা করলে এই ভাবে বলতে হয়—
"পদদলিত ঊষাবলীর লাজরক্তিমায় রঞ্জিত কোন দেবতার অমল পদাঙ্গুলির মত সিন্দুরবর্ণ"

কবি মালার্মে

আরও সহজ-সুন্দরের আরও সরল ঋজুর অভাব নাই—শুনুন

Fuir ! là-bas fuir ! Je sens que des oiseaux sont ivres
D'être parmi l'écume inconnue et les cieux !

পালিয়ে যেতে হয়, পালিয়ে যেতে হয় ওই ওখানে ! অজানা ফেনরাজির, দূর আকাশের কোলে স্থান পেয়ে পাখীরা মাতাল হয়ে উঠেছে, আমি যে অনুভব করছি।

মালার্মের একটি পুরো কবিতা শুনুন। মালার্মের কবিতার মণ্ডনশ্রীর কথা বলেছি—এবার বস্তুর, অর্থের দিক দিয়ে কিছু রসগ্রহণ করতে চাই। আমি অবশ্য অনুবাদ করতে অক্ষম—দেব শুধু অর্থ হিসাবে ভাষান্তর, যাকে বলে paraphrase ; তবে তারই মধ্যে একটু কাব্যের রসায়ন দিতে চেষ্টা করব। কবিতাটি একটি সনেট—অতি সুবিখ্যাত এবং রসিকজনের অতি প্রিয় (যদিও কোন কোন বৈয়াকরণ তাতে বাক্যগঠনে অশুদ্ধি, ত্রুটী অনেক পেয়েছেন) শুনুন তবে—

তরুণ তেজস্বান সুন্দর দিনটি আজ
তার মাতাল পাখার আঘাতে তবে কি দীর্ণ করবে
বিস্মৃত এই জমাট সায়র—ভূতাবিষ্টের মত যে সায়র
হিমানীশীকরতলে
ভাবছে কত বিমানবিহার স্বচ্ছতুষারপ্রপাতগ্রস্ত হয়ে
আর মুক্তি পেল না।

কোন এক অতীতের হংসরাজ আজ স্মরণ করছে
সে ছিল মহিমাময়—কিন্তু এখন বৃথা মুক্তি তার—
যখন বন্ধ্যা হিমঋতুর বিরাগ খরোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
তখন যেখানে আশ্রয় নিতে হয় তার কথা সে ত গায় নাই।
পাখীর উপরে আকাশে চাপিয়ে দিয়েছে এই যে শুভ্র
মৃত্যুযন্ত্রণা—

শিল্প কথা

—আকাশকে পাখী অস্বীকার করেছে বলে—
তাকে সমস্ত গ্রীবা থেকে সে ঝেড়ে ফেলে দেবে,
কিন্তু মাটির নির্ম্মমতা ঝেড়ে ফেলতে পারবে না—
এর সাথে তার পালকসম্ভার জুড়ে গেছে
প্রেতের মত তার শুভ্র দীপ্রতা নিয়ে বাঁধা পড়েছে এখানে—
ধীরে সে অসাড় হয়ে গেল—এই নিরর্থক নির্ব্বাসনে
হংসরাজ আপনাকে আচ্ছাদন করলে তার তাচ্ছিল্যের
নিথর স্বপ্ন দিয়ে !

কবিতাটির অর্থ কি এখন ? সোজা কথায় কি ব্যাপার ঘটল ? এক সাদা রাজ-হাঁস সাদা বরফের তলে চাপা পড়েছে—স্বপ্ন দেখছে, কোথায় উড়ে যেতে পারত সে, অথচ ওড়া হয় নাই। একটু চেষ্টা করলে—সুদিন এসেছে ভেবে। ঝেড়ে ঝুড়ে মাথাটা শুধু বের করলে—জমাট ঠাণ্ডার ভেতর থেকে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। বাকী সারা দেহটা যে তার লেপ্‌টে গেছে মাটির সাথে। ধীরে ধীরে সব ঠাণ্ডা হয়ে এল—অসাড় হয়ে গেল—মৃত্যুকে বরণ করলে কিন্তু বিপুল তাচ্ছিল্যের সাথে।

এই ত মোট ঘটনা—স্পষ্টার্থ। কিন্তু এ ছাড়া গূঢ়ার্থ আছে কি কিছু ? বলা যেতে পারে সে রকম কিছু নাই—বা থাকবার প্রয়োজন নাই। এ হ'ল বাস্তবিকই এক রাজহংসের কথা। শীতের সময়ে বাহাদুরী ক'রে সে তার উত্তুরে দেশেই রয়ে গেছে, দক্ষিণে গ্রীষ্মের দেশে দেশান্তরী হয় নাই—তাই তার দুর্দ্দশা। এই দুর্দ্দশার এক অপূর্ব্ব চিত্র, জ্বলন্ত জীবন্ত ফটোগ্রাফ দিয়েছেন কবি।

অনেকেই এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হবেন না। কবিতাটির মধ্যে স্পষ্টই যে অনুভব করি একটা গাঢ় গভীরতর স্রোতের টান। ঐ অর্থটুকু কবিতাটির সম্যক মর্য্যাদা দেয় না। তাই কেউ কেউ বলেন হংস এখানে স্বয়ং কবি। কবি জগতের মধ্যে আছেন নির্ব্বাসনে—জগৎ তাঁর চক্ষে

একটা নিথর বন্ধ্যাত্ব। তিনি আপনাকে সরিয়ে নিয়ে আছেন আপনার দুর্গের মধ্যে (Tour d'ivoire), আছেন আপনার স্বপ্নকে নিয়ে। মালার্মে ছিলেন অনেকখানি নির্জ্জনতাপ্রিয়, অন্তর্মুখী। তাই কেউ কেউ এখানে দেখেন কবির "art for art's sake" তত্ত্বের সমর্থন উদাহরণ।

আবার আর কেউ বলেন এই যে শীতে বরফের শ্বেত শুভ্রবিস্তার এ হ'ল কবির "সাদা খাতা"—অর্থাৎ প্রেরণার অভাব। কবি এর বিরুদ্ধে দারুণ চেষ্টা করছেন, প্রেরণার জন্য সাধ্যসাধনা করছেন—কিন্তু ফল নিষ্ফল। কবি তাঁর মনের মত কিছু সৃষ্টি করতে পারলেন না— মালার্মের সৃষ্টিপ্রাচুর্য্য ছিল না। কিন্তু কবি দেখালেন তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না—কিছু সৃষ্টি করতে না পারলেও তিনি তিনিই।

আমার কিন্তু মনে হয় কবিতাটির মর্ম্ম-কথা আর এক দিকে। এবং সেইটিই সোজা এবং সহজ দিক। আমি বলি হংস আর কিছুই নয়—সে হ'ল অন্তরাত্মা (Soul)। অন্তরাত্মার প্রতীক হিসাবে হংস খুবই সাধারণ ও পরিচিত। আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষকে যে বলে পরমহংস তা এই জন্যে। পরমহংস—পরমাত্মা,—"great goose" নয় (ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেউ কেউ যেমন অনুবাদ ক'রে থাকেন)। কবির অন্তরাত্মা ঊর্দ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল না,—লোকোত্তর চেতনাকে, যা তার নিজের ধাম তাকে অস্বীকার ক'রে রইল এই মাটির মিথ্যা চোখঝলসান মায়ার মধ্যে, হারিয়ে ফেলল তার স্বকীয় ভাস্বর মাহাত্ম্য। যখন তার স্মরণ হ'ল, চেতনা যখন ফিরে এল, তখন আর সময় নাই। নিজের কর্ম্মফল এখন তাকে ভোগ করতেই হবে। এই সুন্দর শুভ্র দিন আজ মুক্তির নয়—মৃত্যুর। নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান— ভগবানকে, আপনার সত্যস্বরূপকে যে চায় নাই, সেই মুহূর্ত্তেই সে আপনাকে নিপাতিত নির্ব্বাসিত করেছে এই পার্থিব হিমশীতল মৃত্যুরাজ্যে। তবুও, তবুও মৃত্যুর কবলিত হয়েও, অন্তরাত্মা কি কখনও মৃত্যুর বশীভূত হ'তে

পারে? মৃত্যু যখন তাকে অধিকার ক'রে বসেছে তবুও তখন কোন স্বপ্ন তাকে মর্ত্ত্যধর্ম্মের উপরে তুলে নিয়ে গিয়েছে?

এভাবে গ্রহণ করলে কবিতাটির সকল ব্যাসকূট সরল হয়ে যায়—প্রত্যেক বিশেষণটির, প্রত্যেক গুণ, প্রত্যেক রঙটির সার্থকতা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থের ফাঁক কোথাও কিছু থাকে না। অনুভূতির এই গভীরতা, এই অর্থগৌরব থেকেই সহজে ব্যাখ্যাত হয় সমস্ত কবিতাটির গাঢ় গুরুত্ব ও সমুচ্চ তীব্রতা। অবশ্য কেউ কেউ বলেন মালার্মের কবিতার শুধু একটী মাত্র অর্থ নাই—তার আছে যুগপৎ বহু অর্থ। তাঁর কবিতা প্রতীকময়—প্রতীকের ধর্ম্মই এই তা বিবিধ অর্থজ্ঞাপক, নানা ব্যঞ্জনাসমাহার। একজন ফরাসী সমালোচক এ ধরণের কবিতা—আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টির বিশেষত্ব যা—তার নাম দিয়েছেন multiplane বা symphonic poetry.

বস্তুর দিক দিয়ে কবিতাটি দেখা গেল। শ্রীর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এখন একটু দেখা যাক গঠন। কবিতাটির গঠন অনবদ্য বললেও যথেষ্ট হয় না—অপরূপ। যেন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিখুঁত ইমারত। সনেট হওয়া চাই (ইতালী বা ফরাসী সনেটের যে ছক) একখানি চার অঙ্কের নাটক। মালার্মের এই সনেটটির প্রতি পাদ এক একখানি জীবন্ত জলন্ত চিত্র। এবং সমস্তটি গ্রথিত এক অনিবার্য্য ক্রমের কাঠামে। আরম্ভের দৃশ্য দিয়েছে—প্রদীপ্ত রেখায় ও রঙে (রঙ যদিও একটি মাত্র, সাদা শ্বেত শুভ্র)—দেশ কাল পাত্র। শৈত্য, শুভ্রতা আর কাঠিন্য এই তিনটি গুণ সমস্ত আবহাওয়া—ভিতরের ও বাহিরের—গড়ে দিয়েছে। সুরু থেকে শেষ অবধি কথার ভাব কথার অর্থ কথার ধ্বনি কথার সুর প্রতি পদে এই তিনটিকে ফুটিয়ে ব্যক্ত ক'রে ধরেছে। প্রথম চিত্রটি, অষ্টপদীর প্রথমার্দ্ধ এই—শুভ্র দিন, স্বচ্ছ বরফ, বরফের উপর হিমানীশীকরপ্রলেপ—শ্বেতশীতল কঠোর শয্যায় শায়িত রাজহংস, শুভ্র পালক তার শুভ্র বরফের

অঙ্গীভূতপ্রায়—তার উড়বার স্বপ্ন সব জমাট বেঁধে ঐ প'ড়ে আছে! এমন সুদিন, ভরসার দিন কি? দ্বিতীয় চিত্র—অষ্টপদীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ—অভাগা চেষ্টা করছে, কিন্তু সে জানে বৃথা চেষ্টা; সময় যখন তার এসেছিল, স্বরূপ যখন তার একবার উদ্ভাসিত হয়েছিল এই মর্ত্ত্যপ্রবাসে, তখনই তার উড়ে যাওয়া উচিত ছিল যেখানে তার যাওয়া উচিত। তৃতীয় চিত্র—ষট্‌পদীর প্রথম অর্দ্ধ—এই চিন্তা এই স্মৃতি ক্ষণকালের জন্য তাকে দিল তীব্র আবেগ—ঝেড়ে কোনমতে মাথাটি সে তুলে ধরলে—কিন্তু আকাশকে সে অবজ্ঞা করেছে, সেই আকাশই প্রতিহিংসার জন্যে বুঝি বরফের ভার হয়ে তার উপর পড়েছে—আর নিস্তার নাই। শেষ চিত্র—ষট্‌পদীর দ্বিতীয় অর্দ্ধ—ধীরে ধীরে তার সব চেষ্টা থেমে গেল—সাদা সাদায় গেল মিশে, ঠাণ্ডায় মিশে গেল ঠাণ্ডা—জীবন্ত অন্তরাত্মার শুভ্রতার পরিবর্ত্তে এখন ঘিরে রইল প্রেতের মৃত্যুর পাণ্ডুর ধবলতা। শুধু কি-একটা নিথর স্বপ্ন মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে বাঁধা পড়ল তার অঙ্গে।

সমস্তটির মধ্যে রয়েছে একটা ক্রমপরিণাম—সুরের আরোহ, অবরোহ, লয়। প্রথমে—আশা, দ্বিতীয়—স্বপ্ন ও সঙ্কল্প, তৃতীয়—উৎসাহ-প্রয়াস, চতুর্থ—নির্ব্বাণ। সমস্তের পিছনে রয়েছে একটা কারুণ্যের ব্যর্থতার রেশ—কিন্তু কে বলবে তা শুধু আপাতপ্রতীয়মান নয়, তা নিয়ে যাবে না দূর সার্থকতার দিকে? এ-রকমে দেখলে মনে হয় কবিতাটিকে কথা হ'তে সুরে সহজেই রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ফলতঃ কবির আর একটি দীর্ঘতর কবিতা সত্যসত্যই সঙ্গীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে। কথায় সুর লাগান নয়—কথার পরিবর্ত্তে শুধু সুরের লীলা। সমস্ত কবিতাটি—মোটের উপর নয়, প্রায় প্রতি পংক্তি ধ'রে ধ'রে—কথার পরিবর্ত্তে সুরে ছন্দিত করা সম্ভব হয়েছে কবিতাটির গড়নের কল্যাণে। কবিতাটির নাম "কিন্নরের দিবাস্বপ্ন" (L'aprés-midi d'un Faune)—গীতকার স্বনামধন্য দেবুসী (Debussy)।

উপনিষদের সুন্দর

ঋগ্বেদে যখন বলে—

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাগাৎ
চিত্রঃ প্রকেতোঽজনিষ্ট বিভ্বা।

"এই যে সকল জ্যোতির শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এসেছে—এক বহুল জ্ঞান বিশ্ব ঘিরে জন্মেছে"—

রুশৎবৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাৎ
আরৈগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ

"রক্তিম শিশু অঙ্কে, আরক্তিম আননে শুভ্রা মাতা এসেছে—কৃষ্ণা মাতা তাহার সকল ভবন খুলে ধরেছে"—

তখন কাহারও মনে কোন সন্দেহ ওঠে না যে এখানে আছে সৌন্দর্য্যের বোধ, সৌন্দর্য্যের প্রকাশ—বস্তুটি এত সুনিশ্চিত ও সহজগ্রাহ্য হ'য়ে ফুটে উঠেছে। সকলেই এক বাক্যে বলবেন যে এখানে সুন্দর জিনিষ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর পরে যখন শুনি উপনিষদে বলছে—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

"সূর্য্য সেখানে জ্বলে না, চন্দ্রতারকাও নয়, এই বিদ্যুৎ সবও জ্বলে না—এ অগ্নি তবে জ্বলবে কি রকমে? সেই বস্তুটি জ্বলে, তারই অনুসরণে এ সমস্তই জ্বলছে, তারই ঔজ্জ্বল্যে এই যাবতীয় বিশ্ব প্রোজ্জ্বল"—

তখন হয়ত সন্দেহের অবকাশ হতে পারে। অনেকে বলবেন এখানে সৌন্দর্য্যের বোধ নাই, আছে সত্যের বোধ। ঔপনিষদ চেতনায় সৌন্দর্য্য-বোধ আপনাকে ফলিয়ে ধরে নি, সম্মুখে প্রকট করে নি। তা বৈদিক সৌন্দর্য্য-বোধের মত স্পষ্ট, সহজগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর নয়। সে পিছনে অন্তরালে থাকতে ভালবাসে,—যেন নিজের ঘর—স্বং দমং—ছেড়ে বাইরে আসতে চায় না: সেখানে আপন স্বরূপে সে নিরাভরণ, অনাবৃত, একান্ত সহজ। সৌন্দর্য্য বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি রূপগত সৌন্দর্য্য। সে-রূপ অলঙ্কার-প্রচুর, ঐশ্বর্য্য-ভূয়িষ্ঠ যদিই বা না হয়, তবুও তার থাকে একটা সুষীম আকার। প্রাচীনতর বৈদিক ঋষিদের লক্ষ্য ছিল সুরূপ সৃষ্টি ("সুরূপকৃত্নুং"), নির্দোষ অভিব্যক্তি, অখণ্ড ও পরিপূর্ণ বিগ্রহ। তাঁরা যে সকল দেবতাদের দেখেছেন ও আহ্বান করেছেন তারা হল সৌন্দর্য্য হতে সুষমা হতে উৎকীর্ণ তেজোময় সত্তা, আমাদের প্রত্যক্ষের কাছে সুখলভ্য করে রূপায়িত ("সুপায়নং")। কিন্তু উপনিষদে জোর দিয়েছে রূপের বাহিরে বা উপরে যে তুরীয় বস্তু—চক্ষু যা দেখতে পায় না, দৃষ্টিতে যা প্রতিবিম্বিত হয় না,—তার উপর—

> ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
>
> ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চিনৈনম্।

জিনিষের রূপ সুন্দর হতে পারে, কিন্তু অরূপেরও আছে এক সৌন্দর্য্য—যা সৌন্দর্য্যের সার, আদি মূল, চরম পরিণতি, যা সৌন্দর্য্যের প্রচ্ছন্ন অন্তঃপুরুষ। এই বস্তুটিই ঔপনিষদ ঋষি-কবির উপলব্ধিকে, কাব্য-সৃষ্টিকে একটা আত্মসমাহিত অন্তর্গূঢ় গাঢ় উদ্দীপনায় অনুরঞ্জিত স্পন্দিত ক'রে তুলেছে। উপনিষদ বাইরের বহুল বিচিত্রের আকর্ষণে মুগ্ধ হয় নি—সে জানে নানা বলে এখানে কিছু নাই—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। সে দেখছে বাইরের যত বিবিধ রূপ তাদের অশেষ ব্যক্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে দিকবিদিক ভরে দিয়েছে, তারা অন্তরে গোপনে পোষণ করছে

এক অপরূপ সৌন্দর্য্য। এই মাতৃক উৎসগত স্বরূপই বহুলরূপে বিম্বিত বিকীর্ণ হচ্ছে—

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা

রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ—

বীজ এক, তাই বহুধা হয়ে বাইরে ফুটে উঠেছে—একং বীজং বহুধা যঃ করোতি। সৌন্দর্য্যের এই যে বীজ-সত্তা, গূঢ় নাম, তার তুলনা এ পারের প্রকৃতির কোনো কিছুর সাথে মেলে না—ঐহিক ভূমিতে তার কোন প্রতিকৃতি নাই—ন তস্য প্রতিমা অস্তি। ব্যক্ত চেতনা যে সব উপাসনা করে তা সে নয়—তা নেতি নেতি।

তথাপি দেখি উপনিষদ প্রায়ই দুইটি লক্ষণ, দুইটি গুণের দ্বারা সেই অনির্ব্বচনীয়—সেই গুণাতীত বস্তু নির্দ্দেশ ক'রে থাকে। এই দুইটি যেন সেই অনির্দ্দেশ্যের মূল প্রকৃতির প্রায় অঙ্গীভূত। উপনিষদের উপলব্ধিকে, চেতনাকে এরা এতখানি অভিভূত করেছে যে, তার সমস্ত অনুরাগ, সৃষ্টির আবেগ এদেরই ঘিরে ফুটেছে। অনামের অরূপের যে অপরূপ মাধুর্য্য ইন্দ্রজাল তা ব্যক্ত হয়েছে এই দুটির মধ্যে। এই দুটিতে মিলে যেন দিয়েছে তার সমুন্নত সার্থকতা, তার অমোঘ সত্যতা। এই দুটি অঙ্গের একটি হল জ্যোতি—আলো—সৌরদীপ্তি—"রবিতুল্য রূপঃ"; সকল তমসার পারে নিষ্কলঙ্ক স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি—বিরজং শুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। দ্বিতীয়টি হল আনন্দ—পরমসুখ—বৃহৎ জ্যোতিকে পরিপূর্ণ করে আছে যে অমৃতত্ব—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

আর, আলো ও আনন্দ ছাড়া সৌন্দর্য্য কাকে বলি? আলো এবং আনন্দ এই দুইয়ের সম্মিলনেই ত সৌন্দর্য্যের মূল প্রকৃতি, তার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব ধর্ম্ম। জিনিষ সুন্দর মনোহর কান্তিময় তখনই যখন সে আলো বিকীরণ করে। এমন কি এতদূর বলা যেতে পারে যে, যে জিনিষ যত বেশি আলো ছড়ায়, সে তত সুন্দর—তাই বলা হয়েছে রবিতুল্যরূপ।

উপনিষদের সুন্দর

হীরক কেবল অমূল্য নয়, অতি সুন্দরও, কারণ, সে তার মর্ম্মে ধারণ করে সংহত অনির্ব্বাণ প্রভা। কালো কুৎসিত নিরর্থক বস্তুখণ্ডও এই রকমেই শিল্পীর হাতে হ'য়ে ওঠে মূল্যবান সার্থক সুন্দর—যখন সে পায় তার আলোক-প্রতিমূর্ত্তি—যখন দেখান হয় কিরণরেখার সমবায়ে কি রকমে তার আকারটি গঠিত হ'য়েছে—

অন্তঃ শরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো—

শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃশরীরটি দেখানই সমস্ত চিত্রবিদ্যার লক্ষ্য—চিত্রবিদ্যার পদ্ধতিই আলোর খেলার সহায়ে সৌন্দর্য্যের রূপায়ন।

আনন্দ হল এই জ্যোতির গতিছন্দ। আনন্দ ছন্দায়িত আলোক-ছটা—সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা এই। যেখানে আলো সেখানেই প্রসন্নতা, উৎফুল্লতা, আনন্দ, হর্ষ। তাই রসময় আর জ্যোতির্ম্ময়—এই দুটিতে মিলে দেয় সত্যের আদিরূপ। এই দুটি দিককে উপনিষদে কখন কখন বলে সৌর ও চান্দ্র রূপ। সূর্য্য অবশ্য জ্যোতি অর্থাৎ সত্য; আর চন্দ্র হল সোম, অমৃত, আনন্দ, রস অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, তার বিশেষ রূপে। তাই উপনিষদের উক্তি—

যত্তে সুষীমং হৃদয়মধি চন্দ্রমসি শ্রিতং
তেনামৃতত্বস্যেশানে

"হে অমৃতত্বের অধীশ্বর! চন্দ্রের মধ্যে আশ্রিত তোমার সুষীম হৃদয়" কিংবা

রয়িরেব চন্দ্রমা······মূর্ত্তিরেব রয়িঃ

"চন্দ্রই আনন্দ······আর আনন্দ অর্থ ব্যক্ত আকার···"।

ঔপনিষদ চেতনায় রসবোধ একটা আদি মৌলিক বস্তু কিছু—সৌন্দর্য্যকে ছেঁকে, সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মসার দিয়ে তা প্রস্তুত হ'য়েছে। এই সৌন্দর্য্য এঁকে ধরেছে যেন জিনিষের তন্মাত্রিক আকার—তার উৎসগত একান্ত সরল গতিভঙ্গি। এখানে মন্ত্রাত্মক বাক্য একটা অন্তর্লীন সৌন্দর্য্যের রসায়নে অভিসিঞ্চিত; কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ কেবল বৈখরী-

বর্জ্জিতই নয়, তা স্বল্পভাষী অর্থাৎ যতটুকু না বললে নয়, ততটুকু মাত্র বলে —সহজে, সংক্ষেপে, অথচ দৃঢ়ভাবে। এই বাঙ্ময় দেহ নিরাভরণ অনাবৃত। সে অনাবৃত অঙ্গেও আবার মল্লের স্ফীত উদ্বেল পেশী-বাহুল্য নাই। বরঞ্চ তাহার বিশেষত্ব হল তনিমা, লঘুতা—অস্থিমাংসের স্থূলভার নয়। তাতে ফুটে উঠেছে স্নায়ুগত আন্তর সারল্য, তেজ, সামর্থ্য। উপনিষদের—

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে তদেব ব্রহ্ম

"প্রাণের মধ্যে যার প্রাণ নয়, প্রাণেরই প্রাণ যার মধ্যে তাই ব্রহ্ম।"

অথবা,—

নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং···

"অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ,—যা ভূমা তাই অমৃত, আর যা অল্প তাই মর্ত্ত্য।"

কিংবা

সত্যমেব জয়তে নানৃতং

সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ

"সত্যেরই জয়, মিথ্যার নয়। সত্যের দ্বারাই দেবত্বগামী পথ আস্তৃত।"

এ সকলের অপেক্ষা বাক্য আর কত সরল সংযত রিক্ত, অথচ এতখানি সমাহিত স্বচ্ছ, তেজে জ্যোতিতে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হতে পারে? মনে হয় বাক্যের দেহ এখানে শুধু নিরাভরণ বা অনাবৃত নয়—দেহ বিদেহ হয়ে আত্মারই সারূপ্য লাভ করেছে।

বৈদিক ঋষির সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য বর্ণে অলঙ্কারে সমৃদ্ধ; স্থূল ইন্দ্রিয় সেখানে স্থূল বিষয়-বৈভবের মধ্যে উৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত। সৌন্দর্য্যের এই আঢ্যতা আর একযুগে আবার ফিরে এসেছিল—আরও মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত, বুদ্ধিরচিত রূপ নিয়ে। এই বিদ্যাবত্তার যুগের পূর্ব্বে যে একটা সহজ সৃষ্টির, আদি কবির—ব্যাস বাল্মীকির—যুগ ছিল, উপনিষদের সাদৃশ্য ও সাজাত্য কতকটা তার সাথে পাই। বলা হয় উপমা কালিদাসস্য।

উপনিষদের সুন্দর

সত্যই কালিদাসের সৃষ্টি উপমাভূয়িষ্ঠ—উপমার উপর উপমা দিয়ে, মণ্ডনের উপর মণ্ডন সাজিয়ে, তিনি স্তূপীকৃত করেছেন—সে উপমা আবার জটিল, অর্থের দিক দিয়ে, রূপের দিক দিয়ে। বাল্মীকি বা ব্যাসের উপমা সরল সহজ সাধারণ অতি-সংক্ষিপ্ত—অথচ তাতে ফুটে উঠেছে একটা বৃহৎ ব্যঞ্জনা, বিপুল আত্মসংহত শক্তি। সেই একই সারল্য, সংক্ষিপ্ততা এবং অর্থপ্রসার ও ধ্বনি-সামর্থ্য উপনিষদের বৈশিষ্ট্য।

বাল্মীকির

আকাশমিব দুষ্পারম্

"আকাশের মত দুষ্পার।"

কিংবা

গতার্চ্চিষমিবানলম্

"বিগতশিখা বহ্নির মত"।

অথবা

তেজসাদিত্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ

"তেজে আদিত্যপ্রভ, ক্ষমায় পৃথিবীসম"

কিংবা ব্যাসের

বিবেশ রঙ্গং বিস্তীর্ণং কর্ণঃ
পাদচারীব পর্ব্বতঃ

"বিস্তীর্ণ রঙ্গমধ্যে কর্ণ প্রবেশ করলেন পাদচারী পর্ব্বতের মত"।

এ সকলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে উপনিষদের

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ

"আকাশের পৃষ্ঠে বৃক্ষটির মত স্বর্গপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া এক অদ্বিতীয়"।

কিংবা

শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ

"তীরের মত তন্ময় হয়ে যাও"।

অথবা,

যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়নাঃ

"এই সকল প্রবাহিনী নদীর গতি যেমন সমুদ্রের দিকে"—উভয়ত্র পাই একই সহজসারল্য, সারগ্রাহিতা, একান্ত মিতভাষিতা, অথচ সেই সঙ্গে ভাগবত ছন্দগত একটা গভীর গম্ভীর দূরসঞ্চারী অনুরণন।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা যেখানে সেখানেই দেখি সৌন্দর্য্য এই রকমেই হ'য়ে উঠেছে যেন অতি সরল স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক। সৌন্দর্য্য যেখানে আপনাকে ফলিয়ে সাজিয়ে ধরতে চায় নি, ঠিক সেই জন্যই তা সেখানে পরমসুন্দর। উপনিষদে সজ্ঞানে উদ্দেশ্য নিয়ে সৌন্দর্য্য-রচনার আয়াস বা প্রচেষ্টা নাই; সেখানে সৌন্দর্য্যবোধ একটা গভীরতর বৃহত্তর চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে আছে। সে চেতনার লক্ষ্য চেতনাই—চেতনার স্বরূপ ও পরিপূর্ণতা—সেই সত্যকে, সৎবস্তুকে জানা ও লাভ করা, যে জ্ঞান পেলে সকল জিনিষ জানা যায়, যা লাভ হলে সকল জিনিষ লাভ হয়। সেই সত্যের চেতনা আবার আনন্দময় অমৃতময়, যে আনন্দের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব তার মূল শাশ্বত সৌন্দর্য্যে, তার আদি রসময় স্বরূপে ফিরে এসেছে।

কবিত্বের স্বরূপ

কাব্য-সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন, তা কাব্য হয়েছে কিনা? অর্থাৎ শুধু পদ্য নয় বা গদ্যের রকমফের নয়, এর চেয়ে বেশি কিছু হয়েছে কিনা? কবিতায় চাই কবিত্ব—তার কম নয়, তার বেশিও অনাবশ্যক।

কথাটি ত বেশ সহজ স্বতঃসিদ্ধ—এমন কি পুনরুক্তি বলেই শুনায়। কিন্তু কার্য্যত তা ঠিক নয়। কারণ সচরাচর কাব্যের রচনায় কি রসগ্রহণে উভয়ত্র আমরা বহু অবাস্তর উপকরণ এনে মিশিয়ে দিয়ে থাকি। বিশুদ্ধ কাব্যরচনা প্রচুর নয় বিশুদ্ধ কাব্যরসও আমরা অল্পই আস্বাদন করি। কাব্যের পছন্দ-অপছন্দ নিন্দা-প্রশংসা আমরা অধিকাংশক্ষেত্রে করে থাকি কবিত্ব-বহির্ভূত মান-মর্য্যাদা-মূল্য অনুসারে। কোন মানুষ দেখতে সুন্দর কিনা, এ প্রশ্ন মীমাংসার সময় কথা তুললে চলবে না, তার বিদ্যাবুদ্ধি কতদূর বা তার স্বভাব-চরিত্রের গুণাবলী কতখানি। যদিও অনেক সময় স্বভাব-চরিত্রের জন্য, বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য মানুষকে আমরা সুন্দর দেখতে পারি বা বলতে পারি। কিন্তু তাতে কথা এক হলেও সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে আমরা গ্রহণ করি। এবং এই অর্থ-বৈষম্য সব সময়ে আমরা ধরতে পারি না এবং অনেক অনাসৃষ্টির সৃষ্টি করি।

মনীষী বেকন আইডোলা (Idola)-র কথা বলে গেছেন। মানুষ সহজে খাঁটি সত্যের কাছে পৌঁছিতে পারে না, কারণ সত্যের চারপাশে ঘিরে রয়েছে অসত্যের বিগ্রহাবলী, যারা আপনাদের সত্য বলে জাহির করতে চায়। এই সত্যের আবরক অসত্য-বিগ্রহ বেকন চারশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সত্যের ভেজালের মত কবিত্বেরও এই চার রকমের ভেজাল আমরা নির্দ্দেশ করতে পারি। খাঁটি কবিত্ব কি জানবার আগে জানা দরকার কবিত্ব কি নয়—নেতি, নেতি।

শিল্প কথা

কাব্যের প্রথম মায়া-বিগ্রহ হল তত্ত্ব। কবিত্ব আর তত্ত্ব এক নয়। অনেক সময়ে একটি গভীর সত্য আমাদের প্রাণকে এতখানি অভিভূত বা আলোড়িত করে যে তার আমরা অন্য সব দিক ভুলে যাই— কথাটির গুণমুগ্ধ আমরা. তার রূপ দেখবার অবসর হয় না। ব্রাউনিং যখন বলেন:

God's in His Heaven
All's well with the world

তার কাছে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের:

Can anyone tell me what she sings

এ সাদামাঠা কথাটি দাঁড় করাতে আমাদের ইতস্ততঃ করতে হয়। অথবা কীট্‌সের:

Truth is Beauty and Beauty Truth

আমরা যতখানি উঁচুদরের কবিতা মনে করি হয়ত কোলরিজের:

The fair breeze blew, the white foam flew
The furrow followed free ;
We were the first that ever burst
Into that silent sea.

ততটা পদমর্য্যাদা অনেকের কাছে পাবে না। আমাদের বাংলার ঘরের কথা যদি বলি, তবে চৈতন্য চরিতামৃতের—

অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে॥—

এই অধ্যাত্মতত্ত্বের সাথে তুলনা করুন ত এই প্রাকৃত লোকায়ত কথা ক'টি:

টোপর পানায় পুকুর ভরেছে কোনোখানে নাই ভাঙা,
জলা বলে মনে হয় ডাঙাগুলা, জলে মনে হয় ডাঙা—

কবিত্ব কোথায় বেশি?

এখানে আরও নির্দ্দেশ করা যেতে পারে যে কেবল ভিতরের তত্ত্ব নয়, বাহ্যতত্ত্বও কবিত্বের মর্ম নয়। অর্থাৎ সত্য—সূক্ষ্ম হোক আর স্থূল হোক—কেবল সত্যকে প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ নয়। দার্শনিক যেমন কবি নন, তেমনি বৈজ্ঞানিকও কবি হতে ভিন্ন। যখন বলা হয় চারুশিল্প প্রকৃতিকে—অধ্যাত্মপ্রকৃতি হোক আর জড়প্রকৃতি হোক—দর্পণবৎ যথাযথ প্রতিফলিত করে—তখন আমরা একটা eidolon-কে—মায়াবিগ্রহকে পূজা করি। "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা" বলি আর বলি "দুগ্ধং পিবতি মার্জ্জারঃ" উভয়টি অকাট্য সুস্পষ্ট সত্য হলেও কোনটিই কবিত্বের পদবীযোগ্য হয় নি—বলা বাহুল্য। সত্য—অধ্যাত্ম সত্য বা স্থূল সত্য—হল কাঁচা মাল। তাকে একটা শুদ্ধির, ধর্ম্মান্তরের ভিতর দিয়ে না নিয়ে গেলে কবিতা হয়ে ওঠে না। সে শুদ্ধি, সে ধর্ম্মান্তর কি? তাইত কবিত্বের রহস্য, ইন্দ্রজাল।

দ্বিতীয় মায়া—ভুল প্রতিমা—হল আদর্শ—নীতি শিক্ষা বার্ত্তা বাণী প্রচার। আদর্শের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন কাব্যস্বরূপের পরিচয় দেয় না। ধর্ম্মানুরাগ, মানবপ্রীতি, দেশসেবা, সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রবিপ্লব (বা রাজভক্তি)—এসব জিনিষ মানুষের চিত্তকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বিচলিত করে—তার প্রতিধ্বনি সাহিত্যে ফুটে ওঠে। এ সকল চিত্তবৃত্তি মানুষের গভীর ও অন্তরঙ্গ জিনিষ, তাদের মূল্যও অনেক, সন্দেহ নেই, কিন্তু কাব্যের কবিত্ব পক্ষে এহ বাহ্য—এসব কাব্যের বহিরঙ্গ, পোষাক-পরিচ্ছদ হতে পারে, কিন্তু তাদের যাথার্থ্য সমীচীনতা মাহাত্ম্য মহত্ত্ব দিয়েই কাব্যময় রূপের মর্য্যাদা নির্ণয় হয় না। স্কট (Scott)-এর

> Breathes there the man with soul so dead
> Who never to himself hath said

অথবা

> স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
> কে বাঁচিতে চায় (রঙ্গলাল)

অথবা

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে (হেমচন্দ্র)

কিংবা

কি কুদিনে ভবে এলি কুসঙ্গে দিন হারাইলি
দীনবন্ধু নামটি একবার দিনান্তরে বললি নে (দাশরথী)

এ সকল বাক্যকে যদি অনেক সময়ে বা অনেকের কাছে রসাত্মক বলে মনে হয় এবং সে হিসাবে তাদের একটা উঁচু স্থানও দেওয়া হয়, তবে বলতে হবে সে রসটি আসলে কাব্যের কবিত্বগত নয়। আজকাল রাজনীতিক ও সামাজিক বিশেষ আদর্শের সেবক ও বাহনরূপে এক এক বিশেষ ধরণের সাহিত্য-সৃষ্টি করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু "নাৎসী"-সাহিত্য, "প্রোলেটেরিয়ন"-সাহিত্য, "নাৎসী", "প্রোলেটেরিয়ন" হতে পারে কিন্তু সাহিত্য পদবাচ্য কতখানি তা বিবেচ্য। আমাদের দেশেও ইদানীন্তন "মুসলিম সাহিত্য" আশা করি এই রকম কোন চোরাগলির দিকে অগ্রসর হবে না।

তবে এখানেও নির্দ্দেশ করা দরকার যে আদর্শ বা আদর্শের মাহাত্ম্য-প্রচার নিয়ে খাঁটি কবিত্ব হয় না তা নয়—আমাদের বলবার উদ্দেশ্য তা নয়, বলি শুধু এই কথা যে ও-সব জিনিষ হল কাব্যের পরিধিগত—ফলফুল শাখাপ্রশাখা কিন্তু কেন্দ্রগত মূলগত যা তা অন্য জিনিষ। কেন্দ্রকে ধরে, ঠিক রেখে যেখানে পরিধি আঁকা হয়েছে সেখানে ঐক্য সৌষীম্য পরিপূর্ণতা দেখা দিয়েছে; আর যেখানে আগে পরিমণ্ডলকে ধরে একটা আকার গড়বার চেষ্টা হয়েছে সেখানে কেন্দ্র হারিয়ে গিয়েছে, এসেছে উৎকেন্দ্রতা শ্রীহীনতা।

এই উৎকেন্দ্রতার জন্যই ধরুন যেমন টেনিসনের Princess (বা বর্ত্তমানে Spender-এর Propaganda poetry) কবিত্ব হিসাবে ব্যর্থ। অন্যদিকে আদর্শাত্মক কাব্য বহু ক্ষেত্রে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা পেয়েছে—

রামায়ণ মহাভারতের কথা ছেড়ে দিলাম, ধর্ম্মের আদর্শ মিলতনে, অধ্যাত্মের আদর্শ দান্তের মধ্যে—দেশপ্রীতির গর্ব্ব ভার্জ্জিলে মূর্ত্তিমান। কারণ কাব্য-সৃষ্টিকালে এঁদের ক্ষেত্রে ধর্ম্মাচার্য্যকে, অধ্যাত্মসাধককে বা দেশপ্রেমিককে নিয়ন্ত্রিত অনুপ্রাণিত করেছে কবিদৃষ্টি।

তৃতীয় মায়া-বিগ্রহ হল ফ্যাসন, হুজুগ—বেকন যার নাম দিয়েছেন Idol of the Market-Place (আমরা বলতে পারি হাটুরে দেবতা)। কাব্যে এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত সুলভ ও পরিচিত। এক সময় ছিল যখন কবিত্ব অর্থ বোঝাত—চাঁদ জ্যোছনা মধুযামিনী বসন্ত কুহু দীর্ঘশ্বাস মূর্চ্ছা বিরহ ইত্যাদি। কেবল আমাদের দেশে নয় সমুদ্রের ওপারেও দুই এক যুগে এরকম ঘটেছিল। আজকাল যেমন—প্রতিক্রিয়ার ফলে হয়ত—ফ্যাসন হয়েছে পচাগলা, মরা, ক্লেদ পাঁক দুর্গন্ধ, লোহালক্কড় ইটপাটকেল—ভিতরের ও বাহিরের বে-আব্রুতা, "বেহায়াপনা" (কোন অতি-আধুনিক কবির দেওয়া সংজ্ঞা)—এসবকে কাব্যবস্তুর সেরা মালমশলা বলে গ্রহণ করা।

আধুনিক আর এক ফ্যাসন হল পরদেশীয়তা (exotism)। ইউরোপীয় সাহিত্য আর ইউরোপীয় বস্তু নিয়ে বা ঢঙ নিয়ে তৃপ্ত নয়—প্রাচ্যের, অসভ্যের, জংলীর কথায় ও চলনে নিজেকে ভরে তুলছে। এবার ইংরেজী-লেখিকা নোবেল পুরস্কার পেলেন চীনাদের মাহাত্ম্য অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য ফলিয়ে দেখিয়ে। আমাদের বাংলাতেও এই পরদেশীয়তা (অর্থাৎ ইংরেজিয়ানা) আজকাল দারুণ সংক্রামক হয়ে উঠেছে। মধুসূদন, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিয়ানা করেছেন চতুরভাবে—বাংলার জমিতে তাঁরা বিদেশী গাছ রোপণ করেছেন বটে কিন্তু তা বাংলা গাছই হয়ে গিয়েছে—আম পেঁপের মত। কিন্তু আজকাল বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সশরীরে ঢুকে পড়েছে—আমদানি করা হচ্ছে কত বিদেশী বিদঘুটে হিপপটেমস। ডিকেণ্টার, ককটেল, আর্টেমিস, সাইরেন—ইউরোপীয় কাব্যের সব পরিভাষা—আর যাদের নাম নেই তাদের রূপ আধুনিক বাংলা কাব্যের সম্পদ।

বাক্য ছাড়া বাক্যের গাঁথুনী, অন্বয়, বাক্যের দোল পর্য্যন্ত আনা হচ্ছে যতটা সম্ভব পাশ্চাত্যের (ইংরেজীর) ভাষা থেকে। কিন্তু এর কতখানি যে উদ্বৃত্ত থাকবে সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ—সাময়িকের, ক্ষণিকের রুচি আর চিরন্তনের রস এক জিনিষ নয়।

সর্ব্বশেষে, চতুর্থত, কাব্যের ভ্রান্তিময় আলেয়া মূর্ত্তি-হিসেবে নির্দ্দেশ করতে হয় বাক্‌সর্ব্বস্বতা। শব্দের জাঁক, তালের জমক, ছন্দের নটন এত চমৎকার বোধ হয় যে তাকেই বলতে চাই কাব্যের কবিত্ব। অনুকার অনুপ্রাসই কাব্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বলে এক সময়ে বিবেচিত হয়েছিল। সুভাষিত ও উদ্ভট কবিতাই গ্রহণ করা হত কাব্যের মানদণ্ড হিসাবে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও মোহিত করে দিয়েছিল গুপ্ত কবির:

চলে যান বিবিজান লবেজান করে—

অন্যে পরে কা কথা। শব্দের ধ্বনির তালের সুরের চাতুর্য্য নৈপুণ্য কাব্যের অঙ্গীভূত বটে কিন্তু তা সর্ব্বেসর্ব্বা বা স্বয় সিদ্ধ নয়—তার স্থান হল পূর্ণাবয়ব মানবাধারে—আত্মমনপ্রাণ দেহযুক্ত সত্তার মধ্যে—অস্থিচর্ম্মমাংসের যে স্থান।

কবিত্ব কি নয়, দেখা গেল। এখন দেখা দরকার কবিত্ব কি। কবিত্ব কি তার একমাত্র প্রমাণ ও পরিচয়—ফলেন পরিচীয়তে। শর্করার মিষ্টত্বের প্রমাণ ও পরিচয় কি? সত্যকার শর্করার আস্বাদন। কবিত্ব কি জানতে হলে যেতে হবে যথার্থ কবিতার কাছে, যথার্থ কবির সৃষ্টির কাছে। শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ বাক্যই কবিত্বের মাপ, মর্য্যাদানিরূপক। এ বিষয়ে ম্যাথু আরনল্ড যা বলে গিয়েছেন, যে পরামর্শ দিয়েছেন তার উপরে আর কিছু বলবার নেই। শ্রেষ্ঠ কবিদের শ্রেষ্ঠ বাক্য সম্মুখে রাখবে, সর্ব্বদা স্মরণে রাখবে—শেক্সপীয়রের:

Absent thee from felicity awhile
And in this harsh world draw thy breath in
pain—

কিংবা

Daffodils
That come before the swallow dares, and take
The winds of March with beauty

কিংবা

Take, o take those lips away
That so sweetly were foresworn—
Seals of love, but sealed in vain,
Sealed in vain

অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের :

Voice······heard
In springtime from the cuckoo bird
Breaking the silence of the seas
Among the farthest Hebrides

কিংবা কীট্‌সের

Magic casement's opening on the foam
Of perilous seas in fairylands forlorn

অথবা যদি গ্রহণ করি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এক একটি লাইন—এই যেমন, শেক্সপীয়রের :

Bare ruined choirs where late the sweet birds sang

কিংবা

In cradle of the rude imperious surge

কিংবা

Poor soul, the centre of my sinful earth

কিংবা মিলটনের :

Fall'n Cherub ! to be weak is miserable

বা

Those thoughts that wander through eternity

বা

While the still morn went out with sandals grey

অথবা মার্লোর :

And burnt the topless towers of Ilion

কি ভগনের

They are all gone into the world of light

অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের :

Or hear old Triton blow his wreathéd horn

কি

The gentleness of heaven is on the sea

Whose dwelling is the light of setting suns.

শুধু প্রাচীন কেন ইদানীন্তন কবিদের নিকট হতেও আমরা কাব্য-মন্ত্র কিছু সংগ্রহ করতে পারি। এই ধরুন ইয়েটস-এর :

Eternal beauty wandering in her way

অথবা

The lidless eye that loves the sun

কিংবা

—a thing once walked that seemed a burning cloud

অথবা এ-ই'র :

It leaped up golden, the shining wanderer

কি

The unwithering life that in the mortal hides

বা

And by their silence men adore the lovely
silence where He dwells

কিংবা হপকিনসের :

With eyes that smile thro' the tears of the
hours

কিংবা রবার্ট গ্রীভ্‌স-এর (Robert Greaves) :

Or the vague weather wanders in the fields

এমন কি শ্যাঙ্কস (Shanks)-এর

And silent oaks with brooding night in their
boughs

অথবা Hardy-র

So the Will heaves through space and moulds
the time

কিংবা আমাদের মনোমোহন ঘোষের

Shipwrecked memory anchors there and my
dead leaves there are green

এই বাক্যসব যদি মন্ত্রেরই মত জপ করি, জপ করতে করতে এদের রসময় সত্তায় ডুবে যাই বা তাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নি, তা হলেই হবে কাব্যোপলব্ধি কাব্যসাক্ষাৎকার।

বাংলায় এই রকম কাব্যের মন্ত্রাত্মক বাক্য কিছু পরিবেষণ না করলে পাঠকেরা আমায় ক্ষমা করবেন না। তা হলে বলি ধরুন বিদ্যাপতির :

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

কিংবা চণ্ডীদাসের

সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাহিল হিয়া

আরও নিকটে এসে ধরুন মধুসূদনের এই অত্যাশ্চর্য্যভাবে মিলটনীয় (Miltonic) লাইন

রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী—

আরও ইদানীন্তন কালের রবীন্দ্রনাথের

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে !

কিংবা

পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ—

আধুনিক, অতি-আধুনিকদের কাছেও হাত পাতলেও ব্যর্থ হব না— সুধীন্দ্র দত্তের

উৎসুক প্রত্যাশা মোর শূন্য দিগন্তরে
নেহারে অস্থির মরীচিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়

অথবা নিশিকান্তের

তোমারে ঘিরিয়া অনিমেষ আঁখি কার
স্বচ্ছ আলোর চাহনিতে চায়

আমি বলছি এগুলি যেন কাব্যসাধনার মন্ত্র, এ বাক্যগুলি জপ করতে হয়, ধ্যান করতে হয় যাতে এদের ধ্বনি অনুরণন কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে। কাব্যরসকে এইভাবে সাক্ষাৎ আস্বাদন করে তবে ত রসিক বা বিদগ্ধ হওয়া যায়। আর কোন উপায় নেই। আর এই সব কাব্যমন্ত্র মিলে যে কষ্টিপাথর তৈরী হয়েছে তারই উপর কষে দেখাতে হবে অন্যান্য কাব্য-সৃষ্টির মূল্য ও মর্য্যাদা।

কবিত্বের স্বরূপ

অবশ্য এখানে সহজ একটা প্রশ্ন উঠবে—এই যে কতকগুলি বাক্য সংগ্রহ করে কাব্যের একটা মানদণ্ড খাড়া করা গেল, এ কি সঙ্কলয়িতার সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট রুচির পরিচয় মাত্র নয়? অন্য ধরণের কাব্য—যার সুর ধ্বনি চলন বলন কিছুই এ সকলের অনুরূপ নয় তা—কি কখন মাগাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। বিভিন্ন সংস্কলয়িতা—অর্থাৎ বিভিন্ন রুচির মানুষ—কি বিভিন্ন তালিকা দেবেন না, কাব্যের মানদণ্ড হিসাবে?

ম্যাথ্যু আর্নল্ড অবশ্য বলেছিলেন, গুণীজনের বিদ্বৎ-সমাজের রুচির কথা। এবং তিনি এ ক্ষেত্রে "নানা মুনির নানা মত" প্রবাদটির যাথার্থ্য স্বীকার করেন নি। যাদের সত্যকার সুনির্ম্মল রুচি, যারা সত্য সত্য গুণী ও বিদগ্ধ—সত্যকার কবিত্ব সম্বন্ধে তাদের ঐক্য ও মিল মূলতঃ থাকবেই। কথাটির ভাষ্য আমরা এই ভাবে করতে পারি। প্রথমে বলা দরকার, সুধীসমাজ অর্থে একটা সমিতি বুঝায় না এবং তার মত সকলের বা অধিকাংশের ভোটে গৃহীত প্রস্তাব নয়। এ সমাজ সীমা-পরিচ্ছিন্ন একটি গোষ্ঠী নয়—এর পরিধি অনেকখানি অনিশ্চিত, এর অন্তর্ভুক্ত সভ্যদেরও স্থিরতা নেই। তবুও মোটের উপর তার একটা বিশেষ সত্তা ও রূপ আছে (এই চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল জগতের সব জিনিষই ত এই ধরণের একটা মোটের উপর ঐক্য নিয়ে আছে)। এ সমাজটি আবার দেশগত ততখানি নয়, যতখানি কালগত; তাই বলা হয় কালই কাব্যের অভ্রান্ত কষ্টিপাথর। কাল যাকে বাঁচিয়ে রাখে, ভুলতে দেয় না—সেই সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ, চিরন্তন। তবে এখানেও ইতরবিশেষ আছে—কালের গতিও ঋজু রেখায় চলে না। তাই এমনও হয় দেখি এক যুগে যে কবি বা শিল্পী প্রখ্যাতনামা, পরে তিনি অখ্যাত হয়ে গিয়েছেন, ফিরে আবার হয়ত পূর্ব্বপদে ধীরে ধীরে উঠে এসেছেন; কিংবা নিজের যুগে যাঁকে তেমন বড় বলে মনে হয় নি, সময়ের সাথে সাথে যত দূর হতে তাঁকে দেখা গিয়েছে তত তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। তবুও মোটের উপর সর্ব্বশেষে দেখি না কি—কয়েকটি জ্যোতিষ্ক

যেন সমানে অম্লান রয়ে গিয়েছে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে—এখানে-ওখানে এখন-তখন দুই একটি বিসম্বাদী কণ্ঠের আবরক মেঘ সত্ত্বেও। ভারতের বৈদিক কবিরা—উপনিষদ কবিরা—ব্যাস বাল্মীকি—কালিদাস ভবভূতি মাঘ ভারবি—ইউরোপের হোমর, দান্তে, শেক্সপীয়র—এসখিল সোফোকলা ইউরিপিদ—ভর্জ্জিল—মিলতন—কর্ণেই রাসীন হিউগো—পেত্রার্কা কামোয়েন্স গ্যেটে—এরা মিলে যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী রচনা করেছেন তা-ত আকাশের জ্যোতিষ্ক-রাজীর মতনই মনে হয় সকল ক্ষয়ের পরিবর্ত্তনের ভঙ্গুরতার অতীত শাশ্বত নিত্য সত্য। ইদানীন্তন কালের বা বর্ত্তমানের বা আশু ভবিষ্যের কোন্ কোন্ স্রষ্টা এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে—আর কারাই বা উল্কাপিণ্ডের বা ভ্রষ্ট তারার মত আকস্মিক বা সাময়িক দৃশ্য মাত্র হয়ে পড়বে তাও নির্ণীত হবে একদিন অব্যর্থভাবে, কালেরই সুদূর প্রসারিত শোধনীর ভিতর দিয়ে।

কিন্তু তবুও বলতে হবে এসব কথা বাহ্য। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রকেই কাল যে বাঁচিয়ে রাখবে এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য ব্যতিরেকে আর কিছুকে কাল যে বাঁচিয়ে রাখে না—এর যুক্তি বা ন্যায় কি? বৈদিক মন্ত্র-কাব্য অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এসখিল বা সোফোকলার নাটকাবলীর সামান্য অংশই উদ্বৃত্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে হেসিয়ড অত্যুৎকৃষ্ট কবি নন—তবুও তাঁর সৃষ্টি বর্ত্তে রয়েছে। তবে অবশ্য বলা যেতে পারে এ হল নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

কিন্তু আসল কথার জন্য আরও একটু এগিয়ে যেতে হয়। কবিশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তার হেতু এ নয় যে তিনি গুণী-সমাজে গৃহীত অথবা কাল তাঁকে বর্ত্তিয়ে রেখেছে—এ দুটি বাহ্য লক্ষণ মাত্র, এবং তা সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রেই যে থাকবে এমন নাও হতে পারে। ভিতরকার হেতু হল এই যে কাব্যলোক বলে একটি সত্যকার জগৎ আছে—সকল কাব্য-সৌন্দর্য্যের আদর্শ, মূল-রূপ সেখানে রয়েছে, জাগ্রত জীবন্ত সত্তার মত। কবির কাজ তাঁর কাব্যে সেই নিভৃত আদর্শ ও মূল-রূপের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়া, তাকে গোচর করা,

তাঁর কবি-চেতনাকে তুলে ধরে সেই জীবন্ত সত্তার সঙ্গে একীভূত করা, তার বাহন হওয়া। যে কবি এ কাজ যত সুষ্ঠু ভাবে করতে পেরেছেন তিনি তত উচ্চে। গুণী বা গুণী-সমাজও বলি তাকে যার চেতনা এই কাব্য-লোকের সালোক্যলাভ করেছে। কালও যদি কাব্যের কষ্টি হয়ে থাকে, তার কারণ কালপুরুষ পেয়েছে কাব্য-পুরুষের কতকটা সাযুজ্য লাভ করতে—কাব্যলোক কালাতীত বলে তা নিত্য ও শাশ্বত, তাই কালের ক্রমপ্রসারিত ধারার মধ্যে ধরা পড়তে চায় কেবল সেই কাব্য যা শাশ্বত সনাতন, আর সব—যারা চল স্বল্পপ্রাণ, কালের দীর্ঘায়ত ছন্দের তালে চলতে অক্ষম তারা—যায় ডুবে নিবে হারিয়ে।

কাব্যরসের সঙ্গে ব্রহ্মরস, কব্যোপলব্ধির সঙ্গে ব্রহ্মোপলব্ধির তুলনা করা হয়। ব্যক্তিগত চেতনার একটা শুদ্ধি ও সিদ্ধিই (তা সহজাত হোক আর যত্নকৃত হোক—ভগবৎপ্রসাদের ফলে হোক আর পুরুষার্থের ফলে হোক) সাক্ষাৎভাবে এনে দেয় ব্রহ্মচেতনা ও কবিচেতনা উভয়কেই। এ দিক দিয়ে তা হলে বলা যেতে পারে ব্রহ্মসাধনার পথে সাধুসঙ্গ যেমন সহায় ও সম্বল, কাব্যসাধনার পথেও কবিশ্রেষ্ঠের মহাবাক্য তেমনি সহায় ও সম্বল।

চিত্তের ও চেতনার শুদ্ধি না হলে ব্রহ্মের কি রসের অধিকারী হওয়া যায় না। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ বলে সব রকম রুচিই যে সত্যরুচি বা সুষ্ঠু রুচি তা নয়—যেমন নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং এ কথার জোরে বলা চলে না সব মুনিই ব্রহ্মসিদ্ধ। কাব্য বিচিত্র বহুরূপ হলেও সব কাব্যই যে সত্যকার সুষ্ঠু কাব্য তা নয়। সুন্দর অনন্ত রূপ গ্রহণ করতে পারে বলে সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য লোপ পায় না। কাব্য-জগতের, সম্যক রুচিরও আছে একটা সাধারণ পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম, একটা ঐক্য ও সীমানা—মানুষী বুদ্ধির ও বাক্যের কাছে তা যতই অনিশ্চিত অস্পষ্ট হোক না। রসকে রসের সীমানাকে চেনা ও জানা সাধনার জিনিষ—অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও অশিক্ষিত-পটুত্বের বা সহজ সুলভ অনুভবের স্থান নেই।

আধুনিক কবিত্ব

এলিয়টই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আধুনিক কাব্যের এই রীতি প্রবর্ত্তন করেছেন যে কাব্যের চাল হবে গদ্যের চালের অনুরূপ—গদ্য অর্থ এখানে মুখের চলিত কথা। অবশ্য ভাষা চলিত হবে, মৌখিক হবে, সাধারণ কথা শব্দ ও অন্বয় যথাসম্ভব অনুগমন করবে—কাব্যরচনার এ সূত্র প্রাচীনতর কালেও একাধিক কবি দিয়েছেন এবং কার্য্যতঃ একে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেকাংশে সাফল্যলাভও করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সূত্র ছিল এই ধরণের—স্মরণ করুন তাঁর

Can anyone tell me what she sings ?

অথবা

'Tis eight o'clock,—a clear March night
The moon is up,—

কিন্তু আধুনিক চেয়েছেন আরও বেশি কিছু। শুধু ভাষা বা কথা হলেই চলবে না, শুধু শব্দাবলি বা অন্বয়ই যথেষ্ট নয়—সাধারণের চলনটি অবলম্বন করতে হবে এবং সাধারণের যে আবার শুধুই সাধারণ চলনটি তাই গ্রহণ করতে হবে।

গদ্যপদ্য বলে এক রীতি আছে (poetic prose)। এটি সকল দেশের সকল সাহিত্যেরই এক বিশেষ অঙ্গ। গদ্যরচনা যখন থেকে সমৃদ্ধ হতে সুরু হয়েছে তখন থেকেই এই রচনারীতি দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া আছে পদ্যগদ্য (prose poem)—এটি গদ্য হতে পদ্যকাব্যের দিকে উঠে চলবার আর এক পৈঠে। তার পরের ধাপ হ'ল মুক্তছন্দ পদ্য (free verse)। কিন্তু আধুনিকেরা বর্ত্তমানে যা চান তা এসব রকম ধারা হতে ভিন্ন ধরণের। তাতে পদ্যের বাঁধন, বাহ্যগড়ন যথাসম্ভব থাকবে কিন্তু চাল বা চলন হবে গদ্যের অর্থাৎ তালমান পদ্যের দাবি অনুযায়ী থাকবে কিন্তু সুর হবে গদ্যের।

ফরাসী পয়ার (Alexandrine), কর্ণেই বা রাসীনের উচ্চাঙ্গ দ্বাদশপদী যদি পদ্যের মত পড়া যায় তবে তা বিরস নীরস একান্ত একঘেয়ে শুনায়—কিন্তু মিল যতি সত্ত্বেও পড়ে যাও গদ্যের মত তবে তার সৌন্দর্য্য দেখতে পাবে। বিখ্যাত অভিনেত্রী রাশেল (Rachel) এই আবিষ্কার করেছিলেন বলে তিনি ফরাসী নাট্যজগতে স্বনামধন্যা হয়ে আছেন। আধুনিকের অভিসন্ধি কতকটা এই ধরণের। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক এলিয়টের—না, এলিয়টের কথা পরে বলছি—আগে ধরুন বাঙ্গালী কবির অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি

অনেক দিন খিদিরপুর ডকের অঞ্চলে
কাব্যকে খুঁজেছি প্রায় গরু-খোঁজা করে—

অথবা

তবু তোমরা আজকের মত চুপ করো,
একটু চুপ করে থাকতে দাও আমাকে—

"আঙ্গিক" হিসাবে বলা হয়েছে এ সব নাকি অনবদ্য। কারণ প্রথমটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে হ'ল নিখুঁৎ পয়ার (নূতন ধরণের ভঙ্গকুলীন যদিও) আর দ্বিতীয়টি পাঁচের চালের মাত্রাবৃত্ত অথবা মতান্তরে চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত। অবশ্য ছড়ার মধ্যে এ ঢঙের ছড়াছড়ি· ইংরাজীতে limerick যাকে বলে সেই পর্য্যায়ের এ সব জিনিষ বলতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা নয়, আধুনিক সমঝদারি হিসাবে এ হ'ল বাস্তবিকই গুরুগম্ভীর কাব্য। এ সমঝদারি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আলঙ্কারিকদের এক রসিকতা। নিখুঁৎ শ্লোকের—কাব্যের—দৃষ্টান্ত কি? দুগ্ধং পিবতি মার্জ্জারঃ। কি রকম? শ্লোকে চারিটি পদ থাকা চাই—মার্জ্জারে তাই পাই। শ্লোকে থাকা চাই রস—দুগ্ধ অপেক্ষা সুস্বাদু রস আর কি থাকতে পারে?

রহস্যের কথা যাক। কথ্যভাষা—তার চাল ও সুর—নিয়ে বোধ হয় আসল সমস্যা নয়—সমস্যা আরও গভীরে। কথ্যভঙ্গী নিয়ে প্রশ্নটি এক

দিককার এক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বটে, কিন্তু তা রোগের একটি লক্ষণ বা উপসর্গ মাত্র। কারণ প্রাচীন যুগের সব কাব্যই কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক ভাষায় ও ভাবে রচিত হয় নাই—বরং বিপরীত কথাই সত্য। ম্যাথু আরনল্ড কবিত্বের সেরা grand styleএর পরিচয় দিয়েছেন—যেমন মিলতনের—

Fall'n cherub! to be weak is miserable

কি দান্তের

In la sua volontà è nostra pace

এর চেয়ে সহজ স্বাভাবিক লৌকিক মৌখিক ভাষা ও ভঙ্গি আর কি হতে পারে? মিলতনের বাক্যটি না হয় তাঁর সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বলে ধরে নিলাম, কিন্তু দান্তের রচনা সমস্তখানিই লোকভাষার যথাসম্ভব কাছ-ঘেঁষা হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত কথা তা ত নয়—প্রাচীনেরা কাব্যে লোকভাষায় কথা বললেও তাঁরা সর্ব্বদাই উচ্চাসনখানি বেছে নিয়েছেন, আসীন হয়েছেন সে ভাষার তরঙ্গাবলীর শিখরে শিখরে—তলায়, গর্ত্তে নয়—ভাবভঙ্গী যেখানে সমুন্নত একাগ্র বেগময় সেখানে, তা শ্লথ শিথিল অবসন্ন সেখানে নয়। আধুনিকেরা তাঁদের কাব্যের সুর আটপৌরে কথাবার্ত্তায় যে খাদ (trough) সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন, কেবল তাকেই ধরে থাকতে চেষ্টা করেছেন—পুরাতনের উঁচু বা চড়া সুর যথাসম্ভব বর্জ্জন করে। তাই ত এলিয়ট বলছেন—

Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe.

অথবা

Thank you. If you see dear Mrs. Equitone
Tell her I bring the horoscope myself:
One must be so careful these days.

কিন্তু কেন? মৎলবটা কি? কি উদ্দেশ্য সাধন হয় এতে? প্রথম কথা কবিতায় আর "কাব্যি" চাই না—কল্পনা মায়ারচনা চাই না, চাই না মন-গড়া আকাশ-কুসুম কিছু। চাই সত্যং রূঢ়ং—শিবং সুন্দরং নয়। অনুভব চাও, তীক্ষ্ণ তীব্র নাট্য চাও—তার উপাদান চার ধারে সহজ জীবনে আটপৌরে দিনগুজরানের মধ্যে পড়ে রয়েছে, তার জন্যে আকাশে উড়তে হবে না, স্বর্গ চুঁড়তে হয় না। রোজকার কথা কাহিনীরই মধ্যে মানব-জীবনের সত্যকার রস ও রহস্য নিহিত। নাই? আচ্ছা শুনুন আরও একটু এলিয়ট—

> HURRY UP PLEASE ITS TIME
> HURRY UP PLEASE ITS TIME
> Goonight Bill. Goonight Lou. Goonight May.
> Goonight.
> Ta ta. Goonight. Goonight.
> Good night, ladies, good night, sweet ladies,
> good night, good night.

তবে এখানে লক্ষ্য করবেন গদ্যের ধারাটা ধীরে ধীরে চলছে কোন দিকে—দেখি নাকি অর্থটা কেমন একটু ঘনীভূত হয়েছে—সুরে মোড় ফিরেছে—চালে রঙ ধরেছে? সবই গদ্য, গদ্যাত্মক বটে—কিন্তু কবিকে কারচুপি খেলতে হয়েছে—সূত্র যাই হোক,—গদ্যকে একান্তই গদ্যাবস্থায় রাখলে কবির উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হয় না। কবিপ্রাণ চঞ্চল হয়ে উদ্বেল হয়ে উঠলেই সে আর চেষ্টা করলেও একান্ত খাদে পড়ে থাকতে পারে না। যদি চেষ্টা করা যায়—অনেকে, বিশেষতঃ আমাদের বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে, তা জোর করে সজ্ঞানে করেছেন—তবে ফল এই—

> যারা না জন্মালেই পারতো এই পৃথিবীতে
> বা জন্মালেও আপত্তি করবার কিছু নেই—

কিংবা
আজ বিকেলে হটাৎ দু-পেয়ালা চা খাওয়া ঘটে গেল,
যদিও নিয়মিত চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়—
(যাকে কাব্যে বলা চলে না, বলা চলে "ইয়ার্কী" শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্তের ভাষায়)

আমি বলি কবিচিত্ত যেখানে গাঢ় গভীর কবিকণ্ঠেও ফুটে ওঠে সেই গাঢ়ত্ব গভীরত্ব। এলিয়ট যদি সত্যকার কবি হয়ে থাকেন, তবে হয়েছেন যখন তিনি এই ধরণের কথা বলে উঠেছেন :

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream Kingdom
These do not appear :
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There, is a tree swinging
And voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.

এ বস্তুটুকু তাঁর Madame Sosostris, এমন কি Good Night হতেও বহু দূরের জিনিষ। থিওরী এক জিনিষ আর বাস্তব আর এক জিনিষ—থিওরি কবির মনের, মতলবের রচনা কিন্তু বাস্তবসৃষ্টি কবির অন্তরাত্মার অনুশাসন—সে চলে নিজের খুসিমত—bloweth where it listeth.

সে-থিওরি এক দিককার হ'ল এই—কাব্যের লক্ষ্য নিরালম্ব অসম্বৃত সত্য। আভরণ আবরণ খুলে ফেলতে হবে, চাই

Sunlight on a broken oclumn

সূর্য্যের নির্ণিমেষ প্রজ্জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সব দেখতে হবে। তাই সত্য হ'ল ধুলা বালি কঙ্কর—কঠিন চূর্ণ বস্তু; সজল সবুজ তার উপর একটা মিথ্যা মায়ার প্রলেপ। ধনদৌলত ঋদ্ধিশ্রী হ'ল বাহ্য সমারোহ, কতিপয়ের বিলাস—সার্ব্বজনীন সুতরাং মৌলিক বস্তু হ'ল অভাব দৈন্য রোগ দুঃখ। সভ্য মানুষ শিক্ষিত মানুষ পরগাছা মাত্র—ধরিত্রীর সাক্ষাৎ সন্তান দীন দরিদ্র আদিম অসভ্য মানুষ। জিনিষের মূলে যেতে হবে অর্থাৎ মাথা কেটে অধমাঙ্গের দিকে চলতে হবে—পঙ্কজের রহস্য খুঁজতে হবে পঙ্কের মধ্যে। জিনিষকে এই রকমে কেটে ছেঁটে তার যে ক্ষুদ্রতম নিম্নতম হেয়তম প্রকরণ তাতে পর্য্যবসিত করতে হবে। আমাদের মুনি ঋষিরা মানুষকে সমুন্নত উদ্ধারিত রূপান্তরিত করেছিলেন "বালোন্মত্ত পিশাচবৎ" অধ্যাত্মসাধকে, বর্ত্তমান যুগেও আমরা সেই বালোন্মত্ত পিশাচ চেয়েছি কিন্তু বিপরীত দিকে অধোদিকে যথাসম্ভব চলে গিয়ে। গদ্যকে আমরা যে রীতি হিসাবে চাই, চাই গদ্যাত্মক গতি, তার হেতু ঠিক এই যে মনের মধ্যে আমরা উপরে থাকতে চাই না, চাই নীচের তলায় গড়াগড়ি দিতে।

অবশ্য ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর, দৈনন্দিন ঘরোয়া উপাদান যে কাব্যের মধ্যে থাকতে পারে না তা নয়। কাব্যের মধ্যে তা যথেষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু কবির মধ্যে, কবিচেতনায় সে জিনিষ অর্থাৎ শুধু সে জিনিষ থাকলে চলবে না—কবিচেতনাকে আর একটা জিনিষ দিয়ে গড়তে হয়। প্রাচীন মনীষীরা কবিচেতনাকে ঋষি-দৃষ্টির সঙ্গে একীভূত করেছিলেন অর্থাৎ যে-দৃষ্টি সব জিনিষ দেখে তাকে আনন্ত্যের ছাঁচে ফেলে।

আধুনিকেরা এই জিনিষটাও মানছেন না। অনন্তের জন্য তাঁরা ব্যস্ত নন, কাব্যরসের জন্য তার আবশ্যকতাও তাঁরা অনুভব করেন না, কি স্বীকার করেন না। তাঁদের পদ্ধতি অন্য রকমের। গদ্যময় বস্তুকে গ্রহণ করলাম, কিন্তু তাকে গদ্যময় ধারায় ব্যবহার করা ছাড়া আর একটু বেশী কিছু করা দরকার—নতুবা কাব্যে আর গদ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না—

দুই-ই এক জিনিষ হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক কবিরাও কবিপদবাচ্য হ'তে চান, সুতরাং পার্থক্য একটা তাঁরা স্বীকার করেন স্থাপন করেন বৈ কি, অন্ততঃ কার্য্যতঃ।

পদ্ধতির মূলসূত্রটা হ'ল এই যে যে-বস্তু বা যে-ঘটনা হ'ল কাব্যের বিষয় ঠিক তার নিজস্ব ধর্ম্ম ও প্রকৃতি দিয়ে তাকে ফুটিয়ে ধরতে হবে অর্থাৎ সে-বস্তু বা ঘটনাকেই কথা বলতে দিতে হবে, কবি তার হয়ে কথা বলবেন না। প্রাচীনে ও আধুনিকে এইখানে সমস্ত পার্থক্য বললেও বোধ হয় বেশী ভুল হয় না। ধরুন Wasteland যদি হ'ল বিষয়, তবে তার সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা শুনতে চাই না, শুনতে চাই না তার বিবরণ বিবৃতি (কালিদাসের হিমালয় যে রকম), চাই Wasteland যদি কথা বলতে পারত তবে সে কি বলত, তার নিজের অভিভাষণ—কবি তার হবেন যন্ত্র মুখপাত্র, তার সঙ্গে একীভূত হয়ে প্রায় তাই হয়ে যাবেন যেন। সে রকম Hollow Men যদি হয় কবির লক্ষ্য তবে Hollow Men এর পরিচয় চাই না, চরিত্রচিত্র চাই না, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চাই না—চাই এমন একটা বাক্যের ছন্দের ধ্বনির ব্যঞ্জনার সমাহার যার মধ্যে থেকে শু'ন বেজে উঠছে শুষ্কতা শূন্যতা নৈরাশ্য। চোখের সামনে Wasteland ভেসে উঠছে, শুধু তাই নয় Wastelandএর ভিতর দিয়ে সশরীরে চলি না কি শু'নি যখন

A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket
no relief,
And the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock···
Your shadow at morning striding behind You
Or Your shadow at evening rising to meet you ;
I will show you fear in a handful of dust.

অথবা আমরাই কি Hollow Men হয়ে যাই না যখন কানে বাজে—

> The eyes are not here
> There are no eyes here
> In this valley of dying stars
> In this hollow valley
> This broken jaw of our last kingdoms…

এলিয়ট এ সব জায়গায় যে তাঁর পদ্ধতিতে সাফল্যলাভ করেছেন অনেক-খানি তা স্বীকার করতে হয়।

এলিয়টের Good Night একটু আগে আমি শুনিয়েছি। বিদায়ের পালা কত কবি কত ভাবে গেয়েছেন, কাব্যের এ জিনিষটি বোধ হয় সব-চেয়ে কবিত্বময় অঙ্গ।

ওথেলোর

> Speak of me as I am ; nothing extenuate…

কিংবা হ্যামলেটের

> —the rest is silence—

কি ভর্জিলের অরফিউ যখন বলছে

> Heu sed non tua palmas

অথবা শকুন্তলার সেই—

> সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্

অথবা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

> আমি বর দিনু দেবী, তুমি সুখী হবে।
> ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে—

এ সব মানবহৃদয়ের গভীর নিবিড় মর্ম্মোচ্ছ্বাস—কিন্তু আধুনিকেরা চান জিনিষটা আর এক ভাবে ব্যক্ত করতে। এসবই হ'ল ব্যাখ্যা বিবরণ বর্ণনা —articulation সুঠাম বাচন—কিন্তু আধুনিকেরা চান articulation

নয়, incantation, মন্ত্রজপ। বাচন জিনিষকে সুন্দর হৃদয়গ্রাহী করে এঁকে দেখাতে পারে বটে, কিন্তু মন্ত্র জিনিষটিকেই যেন ধরে দেখায় প্রাণময় ক'রে। এলিয়টের Goo-Night···Good Night···এবং পুনঃ পুনঃ তার পুনরুক্তি বিদায়-স্পন্দনকে সাক্ষাৎ স্ফুরিত ক'রে তুলছে না ?

আর মন্ত্রের এক বৈশিষ্ট্য হ'ল অর্থস্বচ্ছতা নয়, অর্থক্লিষ্টতা। কারণ অর্থ নয়, অর্থাতিরিক্ত একটা জিনিষ তার লক্ষ্য ; মন্ত্রের লক্ষ্য যেমন দেবতাকে অবতরণ করান, দেবতার আবির্ভাব করান, সেই রকম কাব্য সত্যকে বস্তুকে জীবন্ত মূর্তি দিয়ে জাগ্রত করবে। তাই দেখি এলিয়ট যুক্তিগ্রাহ্য পারম্পর্য্য বা অন্বয়কে অবহেলা ক'রে চলেন। ধ্বনির বর্ণসমুচ্চয়ের সংঘাতে তিনি রচনা করেন সত্যের আবাহন বা বোধন। তাই নানা ভাষা মিশিয়ে ফেলতেও তাঁর ইতস্ততঃ হয় না, এবং কাব্যের মন্ত্রত্ব প্রমাণ করবার জন্যই বুঝি তিনি উপনিষদের বাক্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য এক কবিতায় শেষ করেছেন—শুনুন

London Bridge is falling down falling down falling down.
Poi s'ascose nel foco che gli affina.
Quando fiam ceu chelidon — O swallow swallow .
Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie.
These fragments I have shored against my ruins.
Why then Ile fit you. Hieronymo's mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih.

কিন্তু কাব্যে এ হ'ল যাকে বলা যেতে পারে মন্ত্র with a vengeance—প্রায় হ্রীং ক্লীং এর পর্য্যায়ে।

কাব্যকে গদ্যাত্মক করবার পদ্ধতি ও আদর্শ হ'তে মনে হবে আমরা বেশ দূরে এসে পড়েছি। কিন্তু ঠিক তা নয়। এ-ধরণের মন্ত্র গদ্যেরই সার—এতে তাল আছে হয়ত কিন্তু সুর নাই।

আধুনিক কবিত্ব

বাংলায় তবু আমরা এলিয়টের পদ্দায় উঠে যেতে পারি নাই। এর কারণ এলিয়ট রীতিমত গম্ভীর ও রাশভারী (highly serious) এবং তাঁর আছে একটা গভীর অনুভব। তাঁর মস্তিষ্ক যতই খেয়ালী স্বৈরচারী "স্বতন্ত্বরী" হোক না—তার পিছনে একটা গাঢ় রসবত্তা আছে (যদিও তাকে ঠিক কাব্যরস বলতে ইচ্ছা হয় না)। আমাদের দেশে এলিয়টীয় আবহাওয়া যাঁরা সৃষ্টি করতে চাইছেন মনে হয় তাঁদের বাহ্যাঙ্গটিই সর্ব্বাঙ্গ হয়ে উঠেছে, এলিয়টের অন্তঃসার সেখানে নাই। পাশ্চাত্যের আধুনিক কাব্যসৃষ্টি যতই কেবল মগজী-রচনা হোক না—তবু তা হ'ল পাশ্চাত্যের একটা সমগ্রজীবনের বিশেষ প্রকাশ, তার পিছনে রয়েছে একটা গভীর প্রয়োজন, প্রাণের প্রবেগ। কিন্তু আমাদের দেশে এ-জাতীয় সৃষ্টি হ'ল কাগজের ফুল। ইউরোপের আবহাওয়া (সমাজের, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রের মত) কাব্য-ক্ষেত্রেও আমাদের মস্তিষ্ককে বড় জোর একটু উস্কে দিয়েছে, আমাদের প্রাণে দোলা দেয় নাই, আমাদের অন্তরাত্মাকে ত স্পর্শই করে নাই। যখন শুনি (শ্রীঅতুল গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত)

ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ—

তখন এর জুড়ি হিসাবে স্মরণে আসে—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, অথবা শুনি যখন

খুঁজে মেলে নিক ইসারা,
ডাকঘরে নেই ঠিকানা,
চিঠি নেই ; দিবা নিশারা—
ভস্মলোচন তৃষা-রা
ভবঘুরে ঘোরে, ঠিকানা—
পলায় পিশাচ ইশারা!

তখনও অদীক্ষিতের বলতে ইচ্ছা হবে নাকি এ হল স্রেফ abracadabra, হযবরল, অথবা ভাল কথায়, ওঁ হিলিহিলিং কিলিকিলিং?

কাব্য মন্ত্র, স্বীকার করা যায়। কিন্তু মন্ত্র দুই রকমের আছে। আধুনিকেরা অনুসরণ করেন তান্ত্রিকের বামমার্গীয় মন্ত্র। প্রাচীন কবিকুল বৈদান্তিক ও দক্ষিণ মার্গকেই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেছিলেন—

যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—

কাব্যের মহত্ত্ব

লংগিন (Longinus)* প্রচীনকালের রোমসম্রাটদের যুগে বিখ্যাত একজন আলঙ্কারিক। তিনি বলছেন লেখার মহত্ত্ব হল অন্তরাত্মার প্রতি-ধ্বনি। কবির কবিত্ব তত উঁচুদরের কবির অন্তরাত্মা যত উঁচুদরের। ছোট অন্তরাত্মা দিয়ে বড় কবিত্ব হয় না।

আধুনিক একজন ইংরাজ সমালোচক † এই কথাটি ধরে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে আধুনিক শিল্পসৃষ্টি এবং সমালোচনাসৃষ্টিও বেশির ভাগ অকিঞ্চিৎকর ও ব্যর্থ, কারণ আধুনিক জগতে ঠিক অভাব বড় অন্তরাত্মা।

বাস্তবিক বড় অন্তরাত্মা দূরে থাক, অন্তরাত্মা দিয়ে সৃষ্টি যে কি জিনিষ আজকালকার যুগে আমরা তা একেবারেই প্রায় ভুলে গিয়েছি। আজকালকার সৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা প্রধানতঃ হল মস্তিষ্ক, আর না হয় স্নায়ু, অথবা দুই-এরই বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ। মস্তিষ্কের কৌতুহল জিজ্ঞাসা আর স্নায়বিক উত্তেজনা ও বুভুক্ষা এই দুইটিতে সত্তার, চেতনার ও জীবনের সবখানি স্থান অধিকার করেছে, এদের ছাড়া গাঢ়তর গভীরতর যা তা অতলে ডুবে তলিয়ে গিয়েছে। সৃষ্টির দিক দিয়ে, শাস্ত্রের দিক দিয়েও আজকাল নীতি ও তত্ত্ব হল এককথায় art for art's sake—আর্টের জন্যই আর্ট। শিল্পী কোন আদর্শের লক্ষ্যের উদ্দেশ্যের তাঁবেদার নয়, সে নিজেই নিজের উদ্দেশ্য লক্ষ্য আদর্শ—স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংসিদ্ধ। আদর্শ ত নয়ই, সৌন্দর্য্যও আজকাল শিল্পের বস্তু বা লক্ষ্য নয়। শিল্প

* Longinusএর "us" বিভক্তিটি লাতিন ভাষায় বিসর্গ বা "অস্"-এর প্রতিরূপ মাত্র—নরস্ অর্থাৎ নরঃ, যেমন।

† The Decline and Fall of the Romantic Ideal by F. L. Lucas.

কি? শিল্পী যা সৃষ্টি করে! শিল্পী কে? যিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। ভাল কথা। কিন্তু নিজে অর্থ কি? এইখানেই যত গোল—সব নির্ভর করে ঐটুকুর উপর। প্রাচীন যুগে নিজে অর্থ ছিল অন্তরাত্মা, আত্মা—আত্মানং জানথ, know thyself। আজকালকার নিজে অর্থ—নিজের একটা বাহ্য অঙ্গ, মস্তিষ্কগত স্নায়বিক চৈতন্য।

আধুনিকেরা বলেন শিল্প ও শিল্পসৃষ্টির একমাত্র রহস্য হল প্রকাশ, সম্যকপ্রকাশ, সম্যক আত্মপ্রকাশ। কিন্তু উপনিষদ বিরোচনের মত "আত্ম" অর্থে তাঁরা ধরেছেন যদিদং উপাসতে অর্থাৎ "স্নায়ুময় পুরুষ"। তবে স্বীকার্য্য বিরোচনের চেয়ে তাঁরা এক ধাপ এগিয়ে—উপরে বা ভিতরের দিকে—এসেছেন ; তাঁরা আবিষ্কার করেছেন অন্নের ও প্রাণের মধ্যবর্ত্তী বা সংযোজক একটা অন্তরীক্ষলোক। প্রাচীন যুগে "আত্ম" অর্থ নিজে বা আপনি নয়—"আত্ম" অর্থ আত্মা অন্তঃপুরুষ।

আধুনিকেরা প্রশ্ন করতে পারেন কবি হতে গেলে সত্যই কি মহান আত্মা বা মহাপুরুষ না হলে চলে না? অতি প্রাচীন কালে কথাটি কিছু সত্য ছিল—ব্যাস বাল্মীকি, হোমর পর্য্যন্তও বলা হয়ত চলে। কিন্তু প্রাচীন কালের লাতিন কবি কাতুল্ল,* মধ্যবর্ত্তী যুগের ফরাসী কবি ভিলন, রোমান্টিক যুগের "শয়তানী" কবিদের বেশির ভাগ, ইদানীন্তন যুগের অস্কার ওয়াইল্ড, ভেরলেন, র‍্যামবো কেউই স্বভাবে চরিত্রে মহাপুরুষ কিছুই নন—কিন্তু তাঁদের কবি-প্রতিভা তাই বলে অস্বীকার করতে বা কম বলতে হবে? বরঞ্চ এই কথাই সত্য নয় কি যে ethics আর aesthetics—সদাচরণ আর রসজ্ঞতা দুটি পৃথক জিনিষ—দুটি কখন কখন এক হয়ত হতে পারে—রসানুভবতা মহানুভবতাকে আশ্রয় করে ফুটে উঠতে পারে—কিন্তু উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ কিছু নাই।

---

* Catullus, এখানেও অন্ত্যের us হল অস্ অর্থাৎ বিসর্গ।

কাব্যের মহত্ত্ব

আর্টে যাঁরা মাহাত্ম্য চান আর যাঁরা তা চান না, চান শুধু রসবত্তা—দুটি দলেরই এখানে একটি বিপুল প্রমাদ এসে দাঁড়ায়। মাহাত্ম্য—মহান আত্মার ধর্ম্ম—অর্থে উভয়েই গ্রহণ করেন সাধারণ নৈতিকতা, আদর্শপরায়ণতা বা বাহ্যজীবনে একটা সুষ্ঠু আচারানুসরণ। আত্মার ধর্ম্ম অন্তরাত্মার গুণ কিন্তু আমরা সে ভাবে গ্রহণ করি না—এ জিনিষ আচারের, নৈতিকতার অপেক্ষা গভীরতর বৃহত্তর বস্তু। আচার, নৈতিকতা না থাকলেও অন্তরাত্মার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। অন্তঃপুরুষের মহত্ত্ব চরিত্রের সৎগুণাবলীর উপর নির্ভর করে না—এ জিনিষ সত্তার নিভৃত চেতনার স্বরূপ। বাহ্যজীবনে তার প্রকাশ আচারের, অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে নাও হতে পারে—কিন্তু তা ধরা যায় স্বভাবের একটা গতিভঙ্গিতে, জীবনধারায় একটা নিভৃত ছন্দে, রঙেরেশে। বায়রণের বাহ্যজীবন কত ক্লেদ কত ক্রুরতা কত নীচাশয়তায় পরিপূর্ণ কিন্তু সেই বায়রণই ছুটে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল নিপীড়িতের মুক্তির জন্য। বায়রণ অর্থ এই উদাত্ত মুক্ত প্রাণ—এখানেই তাঁর অন্তরাত্মা—এই অন্তঃপুরুষেরই প্রবেগ স্ফুরিত হয়েছে তাঁর এই কবি-বাণী মধ্যে—

> Jehova's vessels hold
> The godless heathen's wine!

কবির কাব্যে তাঁর এই অন্তরাত্মার গৌরবই সবখানি ধরা দেয়—তাই ত বলা হয় রচনারীতি, রচনার চাল কি, না, মানুষের মানুষটি। এ জিনিষের প্রকাশ বিবিধ বহুরূপ। শেক্সপীয়রের অন্তরাত্মা অর্থ বিশালতা উদারতা সাবলীলতা— তাতে যেন জলের গুণ, যে পাত্রে ঢালা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, আধারের যে রঙ সেই রঙেই সে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। মিলটনের অন্তঃপুরুষ সমুচ্চতা, গাঢ়তা গুরুত্ব গাম্ভীর্য্য। দান্তের হল তীব্রতা তীক্ষ্ণতা তপস্যার তেজোময় তণিমা। কালিদাসের সুষমাময়—ঔপনিষদ অন্তরাত্মা জ্যোতির্ম্ময়।

অন্তরাত্মার সত্য সচ্চরিত্রতা বা নৈতিকতার মধ্যে ধরা দেয় না, বরং তা ধরা দেয় একটা শালীনতার (manners) মধ্যে।* এই শালীনতাই অন্তরাত্মার নিজস্ব ধর্ম্ম। শালীনতার অভাব যা—অর্থাৎ অন্তরাত্মার অভাব যা তাকেই বলা যায় গ্রাম্যতা (vulgarity)। মানুষের অনেক দোষ থাকতে পারে, সে সবই ক্ষমা করা যায়, ভুলে যাওয়া যায় কিন্তু ব্যবহারে গ্রাম্যতা মানুষকে মানুষ পদবীর বাহিরে নিয়ে ফেলে। সেই রকম শিল্পসৃষ্টিতে যদি থাকে শালীনতা—অন্তরাত্মার প্রভাব—তবে অনেক খুঁত থাকলেও সে শিল্প হবে সুন্দর মহৎ মূল্যবান। কিন্তু শিল্পে গ্রাম্যতা গুণরাশিনাশী, তার অর্থ শিল্পের অভাব।

সত্যকার যে কোন শিল্পসৃষ্টির নাম করুন, তার মধ্যে গ্রাম্যতা (vulgarity) কোথাও নাই। বোদেলের, ভেরলেন, অস্কার ওয়াইল্ড —এই সব যাঁরা প্রাকৃত অভিজ্ঞতার অতলে নেমে গিয়েছেন, তবু অন্তরাত্মার শালীনতা তাঁরা কখনো হারান নাই। তাঁদের ভাষা তাঁদের রীতি তাঁদের চলন বলন কোথাও গ্রাম্যতাদুষ্ট নয়। বোদেলের ত পুরাপুরি অভিজাত—ক্লাসিকাল—"আরিষ্টো"। পক্ষান্তরে নীতিবাদী ধর্ম্মধ্বজী হয়েও এমন অনেককে দেখা যায় যাঁরা শালীনতা—অন্তরাত্মার সৌরভ—অর্জ্জন করতে পারেন নাই, তাঁদের ধরণধারণে রয়ে গেছে অসংস্কৃতি, গ্রাম্যতা। কারণ এ বস্তুটি বস্তুতঃ শিক্ষা করা অর্জ্জন করা যায় না—মানুষ তার জন্মের সাথে একে নিয়ে আসে আর এক জগৎ থেকে—cometh from afar— বাহিরে এর প্রকাশ রুচির মধ্যে। গ্রাম্যতার অর্থ রুচির অভাব—মোটা জিহ্বা, যাতে ধান্যের রসের কাছে আঙ্গুরের রস বেশী মূল্য পায় না।

কাব্যে গ্রাম্যতার দুই একটি উদাহরণ দিব কি? লুকাস্ অতি-আধুনিক কবি এজরা পাউণ্ডের নাম উল্লেখ করেছেন। ইংরাজীর সাথে

* আমাদের শরৎচন্দ্রকে মনে রাখলে এই পার্থক্যটি বুঝতে কষ্ট হয় না।

গ্রীক লাতিন (তাও আবার ভুল) মিশিয়ে পাণ্ডিত্য বা চাতুরী দেখান, সস্তা অনুপ্রাসের চটক ফলান এসব অতি হীন গ্রাম্যতা ছাড়া আর কি? আমি আমাদের আধুনিকদের কারো নাম করতে চাই না—তবে প্রাচীনতর পূর্ব্বতরদের সম্বন্ধে কিছু বলতে সাহস করতে পারি। মনে করুন লড়ায়ে কবিদের কথা। তাঁদের বেশির ভাগেরই মধ্যে কি ভাষায় কি ভাবে শালীনতার প্রাচুর্য্য কিছু পাই না। অবশ্য বলা যেতে পারে এরকম পুরাপুরি লোকসাহিত্য বা ছড়ার ভিতরে উচ্চাঙ্গ রুচি আশা করা অন্যায়। আমি তাই বলছি—শালীনতার অভাব কি তার উদাহরণ স্বরূপ আমি এদের উল্লেখ করেছি মাত্র। তবুও কৃত্তিবাসও যে এ পর্য্যায়ে নেমে পড়েন নাই মাঝে মাঝে তা বলা চলে না—ধরুন তার অঙ্গদরায়বার, ওতে গ্রাম্য কোন্দলেরই সুর পাই না শুধু? অবশ্য বলা বাহুল্য আদিরস হলেই তা অশালীন বা গ্রাম্য হবে তা মোটেও নয়। কালিদাসের কথা ছেড়েই দিলাম —মহাকবি যাতেই হাত দিয়েছেন তাই সোনা হয়ে গিয়েছে। ভারতচন্দ্র বা বৈষ্ণব কবিরা অনেক অশ্লীল লিখেছেন কিন্তু আমার মতে তা অশালীন খুব কমই হয়েছে। বিদ্যাপতির বিখ্যাত

পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব

এ সব কথায় বলার ভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে নৈপুণ্য, একটা শালীনতা (urbanity); তাই কথাগুলি কাব্য হয়ে সকল দোষের পারে চলে গিয়েছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে গ্রাম্যতা ও শালীনতার সীমানা অনেক সময়ে বড় সূক্ষ্ম—এতটুক এদিক ওদিক হলেই এনে দেয় দারুণ পার্থক্য, বৈপরীত্য।

কিন্তু গ্রাম্যতার সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ উদাহরণ আমি দিতে পারি। গ্রাম্যতার আদর্শ যিনি, রাজা যিনি—দুর্ভাগ্য, তিনি আমাদেরই, ভারতের একজন। তাঁর নাম করা দরকার—কারণ তিনি অনেকখানি কুরুচি সৃষ্টি করে, বিষাক্ত হাওয়ার মত তাকে আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখনও যে তাঁর ভক্ত ও পূজারী নাই তা নয়। তিনি হলেন রাজা রবিবর্ম্মা।

রবিবর্ম্মার বিষয়গুলি কিন্তু প্রধানত পৌরাণিক অর্থাৎ দেবদেবী, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি জিনিষ নিয়ে। কিন্তু হলে কি হবে? মহৎ জিনিষ তিনি দেখেছেন একান্ত প্রাকৃতজনের চোখ দিয়ে। গঙ্গাবতরণ চিত্রটি স্মরণ করুন। মহাদেব কি রকম? একজন পালোয়ান—গামা কি কিক্কর সিং—মাথায় পড়ে-পাওয়া জটা বেঁধে, বাঘছাল পরে, পা ফাঁক করে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আর গঙ্গা—লোয়িত কুন্তলা এক "সিনেমা-ষ্টার" এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে কি glide করে নামছেন বুঝি! আর রঙ—তাকে শুধু বলা চলে রঙ-চঙ। গ্রাম্যতার চরম আর কোথাও যে এমন মূর্ত্ত হয়েছে তা জানি না। লোকসাহিত্য, লোকশিল্প আছে—সে সব সোজাসুজি গ্রাম্য অর্থাৎ কাঁচা হাতের কাঁচা গড়ন, তাদের কোন উচ্চ দাবি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, অভিনয় করবার মত কিছু নাই। তারা যা, তারা তাই। কিন্তু এখানে যা আছে, তার অনেক বেশি দেখাব না দেখাবার চেষ্টা। তাই গ্রাম্যতা দারুণ কটু হয়ে দেখা দিয়েছে।

কবির মহত্ত্ব তাঁর ভিতরের চৈতন্যের মহত্ত্ব। এই ভিতরের চৈতন্যেরই প্রকাশ তাঁর কবিত্ব। এই অন্তশ্চৈতন্য যতক্ষণ তাঁর মধ্যে জাগ্রত সক্রিয় ততক্ষণ তাঁর চলনে বলনে তাঁর শালীনতাকে তিনি হারান না, তাঁর সৃষ্টিতে স্থূল হস্তের অবলেপ পড়ে না। মহাকবি তাদেরই বলি যাদের মধ্যে এ রকম আবরণের সম্পাত প্রায় হয়ই না (যদিও কথায় বলে Homer even nods) —ছোট কবি তাদের বলি যারা এই আবরণকে সরিয়ে ধরতে পারে কেবল কখন কখন। অকবির মধ্যে এ আবরণ এঁটে বসে আছে—একেবারে দৃঢ় অনপনেয় হয়ে।

কাব্য ও ছন্দ

কবিতাকে সুনিয়মিত ছন্দোবন্ধ হতে, পদ্যের কাঠামো হতে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা কয়েকরকম রচনারীতি সৃষ্টি করেছে। এগুলি একটি ক্রমিক পর্য্যায়ে সাজান যেতে পারে।

প্রথম হ'ল গদ্য—সরল সাধারণ স্পষ্ট গদ্য। দ্বিতীয়, সুরাত্মক গদ্য (rhythmic prose)। তৃতীয়, গদ্য কবিতা (prose poem)। চতুর্থ, মুক্ত কবিতা (free verse)। আর সর্ব্বশেষ, পদ্য—বন্ধছন্দের কবিতা। ছন্দের প্রয়োজন সব রকম রচনায়। ছন্দ হল রচনার প্রাণ, জীবনীশক্তি। তবে ছন্দের প্রকার ভেদ আছে, এবং এই প্রকারভেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত রচনার উক্ত শ্রেণাপঞ্চক। এই শ্রেণীবিন্যাস অনুসরণ করলে দেখা যায় ছন্দ কি রকম বিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে—ক্রমেই নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত সংহত গাঢ় দৃঢ় (আধুনিকেরা আরো বলবে. কঠিন অসাড় আড়ষ্ট) হয়ে উঠেছে।

উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। রবীন্দ্রনাথ হতেই সব রকমের নমুনা দেব। প্রথম, নিছক নির্জ্জলা গদ্য--সম্পূর্ণতার জন্য এটিও দেই—

"প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোষ্টমাষ্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোষ্টঅপিস স্থাপন করাইয়াছে।"

তারপর দ্বিতীয়, সুরাত্মক গদ্য—

"দেশদেশান্তরে তোমার যত সন্তান আছে, পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র কর তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হোক, দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক।"

অথবা, স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দুর্গোৎসব।"

তৃতীয়, গদ্যকবিতা—"পুনশ্চে"র প্রথম কবিতাটিই—

পদ্মা কোথায় চলেচে বয়ে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
একপারে বালুর চর,
নির্ভীক সে, কেন না নিঃস্ব নিরাসক্ত,—
অন্যপারে বাঁশবন, আমবন,
পুরাণো বট, পোড়ো ভিটে”—

চতুর্থ, মুক্ত কবিতা—“পুনশ্চ”বই

“যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে;
ধরে রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্ন-প্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিবে
যায় চলে তার দেয়না ঠিকানা।”

আর পঞ্চম, পদ্যকবিতা--সেই অতিপুরাতন অতিপ্রিয়

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জাল সন্ধ্যাদীপখানি—

প্রথমটিতে, সাধারণ গদ্যে ছন্দের যেন আদিম মূর্ত্তি—অস্পষ্ট, অস্ফুট, বিশেষ আকার নাই, নিজস্ব সত্তা নাই, বাক্যের অর্থের মধ্যে নিহিত, অর্থের দাস, অর্থকে একটু জোরালো করতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তার স্থান। এখানে ছন্দ হল একটা সাধারণ গতিবেগ মাত্র। দ্বিতীয় পর্দায় ছন্দ কেবল গতি নয়, সে গতিতে ফুটে ওঠে একটা সুর—তান ও লয়। এখানে ছন্দের একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি, বাচ্যার্থের অতিরিক্ত নিজস্ব পৃথক সৌন্দর্য্য ফুটে উঠতে

সুরু হয়েছে—কিন্তু কেবল সুরু হয়েছে, সে মূর্ত্তি তরল, পরিবর্ত্তনশীল। প্রথমে ছিল যেন জলের টানা স্রোত ; এখন সেখানে ঢেউ দিয়েছে কিন্তু "ঢেউগুলি নিরুপায় ভেঙ্গে পড়ে দুধারে", জেগে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, একটির মধ্যে আর একটি মিশে যায়। তৃতীয় স্তরে, গদ্য-কবিতায়, সুর-তান-লয় স্পষ্টতর হয়েছে ; ঢেউগুলি স্ফুট, তাদের গতিভঙ্গ বিশিষ্ট-রূপ নিয়ে উঠেছে। মুক্ত কবিতায় সুরের সঙ্গে আরম্ভ হল তাল—ইতিপূর্ব্বে তাল যদি আরম্ভ হয়ে থাকে, তবে তার ছিল নিতান্ত ভ্রূণাবস্থা ; কিন্তু তাল এখানে অনিয়মিত, কোন সুস্পষ্ট বিধিবদ্ধ ছক তার হয়ে ওঠে নাই —তবু ছন্দের স্বাধীন স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গাঢ় হয়ে উঠেছে, তার স্বকীয় জীবনস্পন্দন আপনাকে ঘোষণা করছে। শেষ পর্য্যায়ে ছন্দ হল একান্ত তাল নিয়ন্ত্রিত সুর : এখানে সে বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে আর সে-রূপ সুস্পষ্ট রেখা-নিবদ্ধ, নিটোল পূর্ণাঙ্গ দৃঢ়, একটা ব্যক্তিত্বময়। ছন্দ আর নিরুপায় তরলিত তরঙ্গভঙ্গ নয়—সে হয়েছে যেন ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তি।

এই যে ক্রমনির্দ্দেশ করা গেল, এটি কিন্তু আদৌ ঐতিহাসিক ক্রম নয়—এটি ন্যায়তত্ত্বগত (logical) এবং মনস্তত্ত্বগত (psychological)। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে দেখি এক বিচিত্র ব্যাপার—সকলের শেষে যেটি সেটি দেখা দিয়েছে সকলের আগে ; কারণ, আদিকালেই উদ্ভব বাঁধা ছন্দের কাব্য। মুখের ভাষা বা গদ্য এমন কি তাও পরে এসেছে—আমি বলছি সাহিত্যরচনা হিসাবে। এর একটি কারণ হয়ত এই যে গদ্য হল প্রধানতঃ বুদ্ধির যুক্তির বাহন—মস্তিষ্কবৃত্তির চলনবলনই গদ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। আর পদ্য গড়ে উঠেছে প্রধানতঃ অনুভবের আবেগের উদ্দীপনার প্রেরণায়। প্রথমযুগের আদি কালের মানুষে ছিল এই দ্বিতীয় ধারার প্রাধান্য। মানুষের জীবন ও সৃষ্টি গোড়ায় চালিত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তার প্রাণময় পুরুষের দ্বারা—তার পক্ষে সহজ ছিল অন্তর্জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব। যুক্তি তর্কবুদ্ধি—মনোময় পুরুষ—মানুষের মধ্যে পরে দেখা দিয়েছে। ইউরোপে যুক্তিসর্ব্বস্ব

১৮ শতক হল সাহিত্যে গদ্যের যাকে বলা হয় স্বর্ণযুগ! আর আধুনিককালে কবিতাকে যে ক্রমে গদ্যধর্ম্মী করে তুলবার চেষ্টা চলছে, তারও একটি কারণ কি এ হতে পারে না যে বর্ত্তমান হল বৈজ্ঞানিক যুগ অর্থাৎ মস্তিষ্কপ্রধান এবং কাব্যের বস্তু ও প্রেরণা উভয়েই আসছে এই মস্তিষ্কের ক্ষেত্র হতে, চিন্তার বিশ্লেষণীশক্তিই কাব্যসৃষ্টির মূলে?

আজকাল সন্দেহ উঠেছে পদ্যই কাব্যের একমাত্র বা প্রকৃষ্ট বাহন কি না। এবং মোটের উপর চলিত সিদ্ধান্ত হয়েছে এই যে নির্জ্জলা পদ্যের চেয়ে গদ্যপদ্যই —আমাদের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী—কাব্যের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হতে পারে। পদ্যের যে নিয়ম— অক্ষর (বা মাত্রা) সাম্য, তাল সাম্য, মিল —তা কি কৃত্রিম নয়? একটি ভাবকে দৃষ্টিকে নির্খুৎরূপে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে—কিন্তু পদ্যের বিধি-নিষেধ মানতে হলে, সেই ছাঁচে ঢালতে হলে, সে ভাব ও দৃষ্টি কি বিকৃত হতে বাধ্য নয়? মিলের খাতিরে, পদ-যতি-তাল ঠিক রাখবার জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনাবশ্যক 'চ-বৈ-তু-হি'র প্রয়োগ ত করতেই হয়। তা ছাড়া পদ্যের ছন্দ ও ছাঁদ ত স্থূল মোটা-গোণাগুণতির ব্যাপার। ছন্দ যা দরকার, তা হবে যেমন সূক্ষ্ম তেমনি বন্ধনমুক্ত— ভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, রাগের বৃহৎ দোল যাতে প্রতিফলিত হতে পারে চাই সেই ছন্দ। ওয়ল্ট হুইটমানের ভাবে ভাষায় যে বিশাল বিপুল অ-শৃঙ্খল কলরোল, কোন্ পদ্যছন্দ তাকে প্রকাশ করবে? বা ফরাসী কবি Viélé Grifiin-এর যে সূক্ষ্ম ভাব বৈদগ্ধ্য বা Paul Claudel এর যে উদার অনুভব-প্রবেগ কি রকমে তা alexandrine (দ্বাদশ অক্ষরের) লৌহ ছাঁচে ঢালাই হতে পারে?

পদ্যের দিক থেকে যে উত্তর নাই তা কিন্তু নয়। প্রথমত অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার। কিন্তু যাকে অনাবশ্যক বলা হয়, গঠন-সৌন্দর্য্যের মধ্যে মিলেমিশে অঙ্গীভূত হয়ে যায় তবে দোষ কোথায়? কাব্যের লক্ষ্য কেবল কথা বলা নয়—সে ত মানুষমাত্রেই পারে—কিন্তু সুন্দর করে,—শুধু তাই নয়, সুন্দরতম করে,—কথা বলা; তাই তাকে একান্ত প্রয়োজনের সীমা

অতিক্রম করতেই হয়। সুন্দরের আরম্ভ ত রূঢ় প্রয়োজনের সীমার বাহিরে থেকে। এদিক দিয়ে দেখলে পদ্যে কেন, গদ্যেও যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয় অবান্তর উপাঙ্গ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাদপূরণ বা গোঁজামিল সাধারণ ছোট কবির মধ্যে সুলভ হলেও, শ্রেষ্ঠ কবির সৃষ্টিতে তা আবিষ্কার করা বড় সহজ নয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা ত তাকেই বলে যার প্রতিটি অক্ষর পর্য্যন্ত অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য, অপরিবর্ত্তনীয়। Sophocles বা Virgil বা Racine-এর পদ্যে বৃথা অবথা বাক্য যিনি খুঁজে বার করতে চান তাঁকে দুঃসাহসী বলব। তারপর পদ্যের কাঠামোর সংকীর্ণতা স্থূলতা যখন নির্দেশ করা হয় তখন মনে জিজ্ঞাসা জাগে হোমর তাঁর Hexametre-এর আটে ঘাটে মহাসাগরের দোল কি রকমে ফুটিয়ে তুললেন, মিলটন অতি প্রচলিত পঞ্চ-মাত্রিক আইএম্বের (iamb) ছাঁদকে ধরে যে অর্গান-সঙ্গীত মন্দ্রিত করে তুলেছেন তার রহস্য কি ? আর পদ্যের বাঁধনে মুক্তি কতখানি যে লীলায়িত হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন শেক্সপীয়র ও সুইনবার্ণ এবং ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও কারু কি পরিমাণে থাকতে পারে তা দেখিয়েছেন রাসীন (Racine) এবং লা ফঁতেন (La Fontaine)।

বরং এ কথা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা যেতে পারে যে রচনার বিভিন্ন ধরণ নির্ভর করে ভাবাভিব্যক্তির বিশিষ্ট প্রয়োজনের উপর—এবং প্রত্যেক-টিরই নিজস্ব সৌন্দর্য্য ও সার্থকতা আছে। হুইটমান যে-ভাবের ভাবুক, হুইটমানের ভাষার ভঙ্গীও তদনুরূপ। রাসীনের ভঙ্গীতে হুইটমানের আত্ম-প্রকাশ হয় না। কিন্তু যদি দাবি করা হয় হুইটমানের পন্থাই উন্নততর মহত্তর সুষ্ঠুতর তবেই তর্ক ওঠে। তখন বলতে ইচ্ছা হয়, প্রত্যেক ভঙ্গী তার আপন ভাবটির সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হলেও, ভাব যত গভীর নিবিড় সমুচ্চ হয়ে ওঠে, ততই তা ধারণ করে পদ্যেরই রূপ। দান্তে ভাবে ভাষায় যে সংহত তীব্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা অনিবার্য্যভাবে বরণ করে নিয়েছে পদ্যের —terza rima-র কঠোর বাঁধন। ভালেরী (Valéry)-র মতে শ্রেষ্ঠকাব্য

মাত্রই গ্রহণ করে ভাস্কর্য্যের গুণ ; তাই আধুনিক কবি হয়েও তিনি পূরাতনের একটি মাত্র ছাঁদে সব কবিতা রচনা করেছেন। গদ্যে কাব্য হয় এক বিশেষ ধরণের, নিম্নতর অনুচ্চ সব চূড়ায় ; কিন্তু কাব্য যত গভীর গাঢ় সমুচ্চ কবিত্ব হয়ে ওঠে, তত সে গদ্যের চলনবলন ছেড়ে ক্রমে গ্রহণ করে পদ্যের শৃঙ্খলিত রূপ। তাই ত দেখি আধুনিক কবিদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা প্রথমে গদ্যছন্দে হাত মক্স করে শেষে পদ্যেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এখানেই যেন তাঁদের কবিচিত্ত শেষে পেয়েছে পরিতৃপ্তি।

ভাষার একটি রহস্য মনে রাখা দরকার—পদ্যের রূপ ভাষার অন্তর্নিহিত সহজ স্বাভাবিক শক্তি, কেন কি ভাবে সে আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। এ শক্তি যেন অগ্নির দাহিকাশক্তি—ভাষার গড়নে স্বভাবে তা অঙ্গীভূত একীভূত, তা কৃত্রিম বা বাহির হতে আরোপিত নয়। ভাষার অন্তঃপ্রতিভা হতেই তা স্বতঃউৎসারিত। অনেক কবির পক্ষে পদ্যে কাব্য রচনা বরং সহজ, গদ্যই তাঁদের পক্ষে দুরূহ।

আরও মনে রাখা দরকার ছন্দের মুক্তি ভাবের দিক দিয়ে যে একান্ত অনিবার্য্য তা নাও হতে পারে। ছন্দোগত মুক্তি বাহ্যরূপেরই একটা পরিবর্ত্তন মাত্র—বাহ্যরূপেরও যদি নূতনত্ব অভিনবত্ব রসহিসাবে উপভোগ করতে চাই সেই জন্য। নতুবা শ্রেষ্ঠ কবিরা প্রায়ই দেখি অতিপুরাতন চলিত সাধারণ ছন্দোবন্ধকেই আশ্রয় করে তাঁদের প্রাণের অন্তরাত্মার যাবতীয় অনুভব সম্পূর্ণভাবে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের মহত্ত্ব ছন্দ আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে না।

আমাদের যুগের কবিরা বেশি সূক্ষ্ম বেশি গভীর বা বেশি বিশাল হয়েছেন ? তাই ছন্দের পুরাতন বন্ধন হতে মুক্তি চাই ? এই তাঁদের দাবি অবশ্য। কিন্তু কার্য্যত কি দেখি ? দেখি তাঁরাও যখন ভাবগাঢ় হয়ে উঠেছেন তাঁদের হাত দিয়ে অজ্ঞাতসারে অথচ কেমন সহজে বের হয়ে

এসেছে খাঁটি পদ্য ছন্দ। Lawrence-এর একটি কবিতায় (The Red Wolf) আশেপাশের অনেকখানি গদ্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত—

Day has gone to dust on the sagegrey desert

কিংবা আমাদের জনৈক গদ্যপন্থী কবির গদ্যরাশির মধ্যে পাই, এরকম নিখুঁৎ পয়ারী পঙ্‌ক্তি—

মহাশূন্যে শুনি বুঝি গাণ্ডীব-টঙ্কার।

নির্জ্জলা গদ্যেও যেখানে তা ছন্দসুন্দর হয়ে উঠেছে, সেখানে যদি নিরীক্ষণ করি তবে প্রায়ই দেখব ছন্দতরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ফুটে উঠতে চেয়েছে, ফুটে উঠেছে পদ্যগত মাত্রা-সুষমা। এই ধরুন বঙ্কিমের (পদ্যের আকারে পর্ব্বগুলি সাজালে)—

ধীরে রজনি ধীরে
দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে
কিন্তু এ আঁধারপুরি আলো করিবে

পদ্য ও গদ্য মিশিয়ে একটা অভিনব ও চমৎকার ছাঁদ বা কাঠামো পাওয়া যেতে পারে। দুই-এরই যা শ্রেষ্ঠ গুণ তাই আহরণ করে এ তিলোত্তমাকে সৃষ্টি করা যেতে পারে। গদ্যের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি এবং পদ্যের সংযম ও সংহতি। পদ্যে আড়ষ্টতা প্রাণহীনতা আসতে পারে—কিন্তু গদ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা বিশৃঙ্খলতাও তেমনি দেখা দিতে পারে। প্রাণ চাই, কিন্তু আত্মসমাহিত প্রাণ—আত্মশাসন ব্যতিরেকে যথার্থ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি হতে পারে না। অবশ্য সকলের উপর মনে রাখা দরকার, গদ্য হোক পদ্য হোক গদ্যপদ্য হোক কি পদ্যগদ্য হোক সব রকম রূপ বা ছাঁচ কবি-চেতনার আধার, বাহন বা অবলম্বন মাত্র। দ্রব্যগুণ হিসাবে এদের নিজস্ব গুণ বা সামর্থ্য যা'ই থাকুক না কেন, এরা প্রকৃত মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অর্জ্জন করে তাদের অন্তর্নিহিত আধেয় ও অধিষ্ঠাত্রী কবি-চেতনার মহত্ত্বকে ও মাহাত্ম্যকে প্রতিফলিত করে।

ছন্দের অ আ

ছন্দ কাব্যের প্রাণ বা জীবনীশক্তি—যেমন অর্থ হল তার মন, আর কথা, বাক্য বা শব্দ তার দেহ। কথায় দিয়েছে কাঠাম, স্থূল আকার—প্রতিষ্ঠা, স্থিতি; ছন্দে দিয়েছে গতি—সজীবতা; অর্থে দিয়েছে জ্যোতি—সত্যের প্রকাশ, উপলব্ধির আলো। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বলব ছন্দের কথা।

ছন্দেরও বলা যেতে পারে আছে আবার তিনটি অঙ্গ—বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ আর অন্তস্তমাঙ্গ। ছন্দের বহিরঙ্গ—কাঠাম, ছাঁচ, স্থূল দেহ—হল মাত্রা। মাত্রা বলতে অবশ্য এখানে বুঝব মাত্রা, পর্ব্ব এবং পদ। এই যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দে—

শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা—

এখানে প্রতি পদ বা পংক্তিতে চতুর্দ্দশ অক্ষর এবং দুইটি পদাংশ বা পর্ব্ব (৮+৬), উভয়ের মধ্যে রয়েছে একটা যতি বা ছেদ। পয়ারের এই বাঁধুনিকে অর্থগত যতির বৈচিত্র্য দিয়ে ভেঙ্গে একটা নূতন গাঁথুনি দিয়েছেন মধুসূদন—

কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে।

অথবা

মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে।

এখানেও মূলে ঐ একই কাঠাম: ৮+৬=১৪।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ একটা দিই—

রাতের নাচন শেষ করে দিয়ে
অপ্সরী গেছে চলে।
লঘু চরণের মঞ্জীর তার
পড়ে আছে ধরাতলে॥

এটি হল ত্রিপদী। মাত্রাবিন্যাস, ৬+৬+৮=২০।

স্বরবৃত্তের উদাহরণরূপে নিতে পারি সত্যেন্দ্রনাথের :—

সবুজ পরী! সবুজ পরী! সবুজ পাখা দুলিয়ে যাও,
এই ধরণীর ধূসর পটে সবুজ তুলি বুলিয়ে দাও—

এটি হল চতুষ্পদী, প্রতিপদে আবার চতুঃস্বর—অবশ্য মনে রাখতে হবে স্বরবৃত্তে চতুঃস্বরই স্বভাবত হল মূল বা ন্যূনতম পর্ব্বের মাপ।

এই রকমে পদবিন্যাস, পর্ব্ববিভাগ এবং মাত্রা, স্বর ও অক্ষর বণ্টন—এই নিয়ে ছন্দের কঙ্কালরূপ—মূল আকার ও প্রতিষ্ঠা। কঙ্কালের উপর মাংস ও পেশীর যোগ হয় ধ্বনির রোলে ও ঝঙ্কারে। ধ্বনির উৎস প্রথমে হল ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাত। ব্যঞ্জনের যথাযোগ্য সমাবেশ—সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বৈপরীত্য পুনরুক্তি প্রভৃতি কারুকার্য্য ছন্দোৎকর্ষের সাধারণ ও সুলভ উপায়। রবীন্দ্রনাথের যে পংক্তি দুটি প্রথমে উদ্ধৃত করেছি, সেখানে একটু লক্ষ্য করে দেখুন—ব্যঞ্জনবিন্যাস কত কৌশলে করা হয়েছে—বলা বাহুল্য কবি ভেবে চিন্তে বেছে খুঁটে, তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেন না, তাঁর নিভৃত শ্রুতি আপনা হতে অবলীলাক্রমে এ কাজটি করে যায়। সে যা হোক, দেখুন এখানে—"শ" এর পুনরুক্তি তারপর ধ, থ, ছ সব উষ্মবর্ণ এবং সাথে সাথে এদেরই কোমল রূপ ত, দ, ক, জ। "ন" এর কোমলতর রণন প্রথম আরম্ভ হয়ে কেমন দ্বিতীয় ছত্রে বহুগুণিত হয়ে বেড়ে গিয়েছে থেমেছে "ন্ত"র মধুর ও জোরাল ঝঙ্কারে। কাব্যের বাক্য এই রকমেই সরস শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। ঝঙ্কারের জন্য অনেক কবি প্রচুর ব্যবহার করেন

স্ত, ঞ্জ, র্ণ, ন্ন—ন'র সব প্রতিধ্বনিত ধ্বনি। ব্যঞ্জনের কলরোল উপলরাশি-প্রতিহত জলধারার মত কেমন মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে শুনুন—

শৈবালে শাদ্বলে তৃণে
শাখায় বল্কলে পত্রে উঠে সরসিয়া
নিগূঢ় জীবন তার···

ইংরাজীতেও দেখুন ব্যঞ্জনের পেলবতা তরলতা—"র" ও "ল" যোগাযোগে—শেলী কেমন ফুটিয়ে তুলেছেন—

Lull'd by the coil of the crystalline streams

আবার রূঢ়তা, রুক্ষতা, কঠোরতা সেক্সপীয়রের এই ছত্রে কেমন দেখা দিয়েছে—

And in this harsh world draw thy breath in pain—

এখানে rsh, rld, dr, br,—"r"-এর যুক্তধ্বনি সব উচ্চারণকে ব্যাহত, ব্যথিত ক্লিষ্ট করেই তুলেছে—অর্থকে সার্থক করে।

ব্যঞ্জনের ধ্বনিমাহাত্ম্য আমরা দেখলাম- কিন্তু এহ বাহ্য। ধ্বনির সূক্ষ্মতর তানের জন্য আরও আগে কহিতে হয়। এই সূক্ষ্মতর তান দিয়েছে স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনকে যদি বলা যায় ছন্দের মাংসপেশী, স্বরবর্ণকে তবে বলতে পারি নাড়ী, স্নায়ু।

ফলতঃ প্রাচীনতর ভাষায় এই স্বরবর্ণের উপরই নির্ভর করছে ছন্দের বৈশিষ্ট্য, গড়ন ও চলন। ব্যঞ্জনবর্ণ সেখানে গৌণ অলঙ্কার, স্বরবর্ণই মুখ্য অবয়ব। স্বরবর্ণের হ্রস্ব দীর্ঘ ও গুরু লঘু বিভাগের কথা আমি বলছি। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন ছন্দের প্রাণ (সুতরাং আমাদের কথায় কাব্যের প্রাণের প্রাণ) হল এই স্বরবর্ণের দোল। বিশেষভাবে গ্রীকভাষায় স্বর-বর্ণের শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিস্ময়কর—অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে ছন্দের স্রোত প্রধানত স্বরকেই আশ্রয় করে চলেছে ব্যঞ্জন সেখানে একান্ত গৌণ সহায় মাত্র। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে স্বরকে ধরে ফুটে ওঠে, ফুলে

ফুলে চলে রেখার দীর্ঘায়ত লতায়িত লাস্য—বঙ্কিমচন্দ্রের অতিপ্রিয় কালিদাসের এই শ্লোকটিতে দীর্ঘস্বরবহুলধ্বনি তার নির্দ্দেশ্য-বস্তু সমুদ্রের কেমন প্রতিচ্ছবি এঁকে তুলেছে—

> দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী
> তমালতালীবনরাজীনীলা
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
> র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।

অন্যপক্ষে, ব্যঞ্জন ছন্দে এনে দিতে পারে গাঢ়তা, দৃঢ়তা, কাঠিন্য—আর ঘনপ্লুত মুখর গতি। প্রাচীন ভাষার মত অর্ব্বাচীন ভাষায় স্বরবর্ণের মাহাত্ম্য অতখানি আর নাই। কারণ আধুনিক ভাষার ছন্দে দোল ক্রমেই নির্ভর করছে ঝোঁকের উপর, টানের উপর নয়। বিশেষভাবে ইংরাজীতে দেখি এই ঝোঁকেরই—দিলীপকুমারের ভাষায়, প্রস্বনের—একাধিপত্য এবং এখানে হ্রস্বদীর্ঘ বা গুরুলঘু স্বর নির্ণয় করা হয় ঝোঁক বা ঝোঁকের অভাব দিয়ে। তবুও একটু মনোযোগ দিলেই দেখা যায় ইংরাজীতেও আছে সত্যকার হ্রস্বদীর্ঘ স্বর। ঝোঁকের আশ্রয়ে ব্যঞ্জন-ধ্বনিই দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে—সেই ঝোঁককে আমি স্বরবর্ণের সাথে সংযুক্ত করছি না। স্বরবর্ণের দীর্ঘ-স্বরেই তার স্বরূপ বেশি প্রকট। সেক্সপীয়রের পূর্ব্বউদ্ধৃত পংক্তিটি দেখুন—harsh-এর দীর্ঘ a, world এর (w) o, draw এর-সুদীর্ঘ a(w) এবং pain দীর্ঘ ai—ব্যথিত দীর্ঘশ্বাসের মত অতি কষ্টে বুক চিরে চিরে বের হয়ে আসছে না! স্বর ও ব্যঞ্জনের যুগ্ম মাহাত্ম্য সেক্সপীয়রের এই লাইনটি অপূর্ব্ব করে তুলেছে। অথবা ধরুন শেলীর,

> Blow
> Her clarion o'er the dreamy earth—

কিংবা

> When I arose and saw the dawn

I sigh'd for thee
When light rode high and the dew was gone

শেলীর যে ভাবময় ব্যোমচারী অশরীরী আবেগ মনে হয় নাকি তা এখানে দীর্ঘ স্বরের টানে টানে উধাও হয়ে চলেছে—এই স্বরের সুরের কল্যাণেই তার পদক্ষেপ লঘু হয়ে পাখীর পাখার গতি পেয়েছে—ব্যঞ্জনের স্থূলতর স্পষ্টতর শব্দকে এখানে ওখানে শুধু স্পর্শ করে, পৃথিবীর স্মৃতিটুকু কেবল জাগিয়ে রেখেছে কোন রকমে ?

বাংলা ছন্দে স্বরের স্থান ও দান কি ? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বিশেষ কিছু নাই। কারণ সাধারণ অর্থে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর বাংলায় নাই—অর্থাৎ নিয়ম-বাঁধা হ্রস্ব-দীর্ঘ, সংস্কৃতের অনুরূপ, এমন কি ইংরাজীর অনুরূপও কিছু নাই। হ্রস্বদীর্ঘকে আমরা সমান মূল্য দিয়ে থাকি—অনেকখানি ফরাসীর মত।

এটি হল সাধারণ মোটা কথা। সূক্ষ্মতর কথা হল এই যে বাংলাতে ধরাবাঁধা দীর্ঘ স্বরের পরিবর্তে আছে ধরাবাঁধা গুরুবর্ণ—এখানে স্বর কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয় বটে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল ঝোঁক—ইংরাজী stress-এর চেয়ে এর সাদৃশ্য ফরাসী accent tonique-এর সাথে অর্থাৎ ধ্বনি দীর্ঘ ও ঝোঁকালো যতখানি হয় তার চেয়ে বেশি হয় উদাত্ত (উঁচু বা চড়া)। যুক্ত বা হসন্ত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্ণ পায় এই ধ্বনি গৌরব (সংস্কৃতের মত)। স্বরমাত্রিক ছন্দে বিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে এ জিনিষটি—ধরুন সত্যেন্দ্রনাথের—

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! বিদ্যুৎপর্ণা !

কিন্তু স্বরবর্ণের ধ্বনি এখানে রয়েছে যেন গৌণ, ব্যঞ্জনের একান্ত অনুগত, ব্যঞ্জনের ধ্বনিকেই মুখরিত করে ধরবার জন্য। স্বরবর্ণের নিজস্ব ধ্বনি, তার এলায়িত তরঙ্গায়িত বিলম্বিত বিসর্পিত চলন ফুটে ওঠে বিশেষ-ভাবে দেখি অযুক্তবর্ণ-যোজনায়, জোড়া-কথা-ছাড়া-পদ রচনায়। এই ধরুন যেমন রবীন্দ্রনাথের—

আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর—

অথবা,

আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা—

এখানে মনে হয় ব্যঞ্জনের ধ্বনি স্তিমিত হয়ে স্বরের ধ্বনিকে প্রাধান্য দিয়েছে—স্বরের টানা রেখায় কি সুষীম আলপনাখানি। কিম্বা ধরা যেতে পারে দিলীপকুমারের—

ঘিরে রাখো মোরে তব নীহারিকা মেখলায় হে মণি-অম্বর…
দোলাও আমারে নীল ঘুমপাড়ানিয়া গানে, হে সিন্ধুমর্ম্মর…

এখানে ছন্দের গতি সমস্তখানি চলেছে স্বরবর্ণের টানা ঢেউ-এর দোলে—শেষ হয়ে গিয়েছে যুক্তাক্ষরের ব্যঞ্জনপ্রধান একটা প্লুত উদাত্ত ধ্বনির মধ্যে, বেলাতটে এসে ভেঙে পড়ে যেমন তরঙ্গমালা।

স্বরবর্ণের দ্রুততর গতিও সম্ভব—দ্রুত অথচ দীর্ঘ পদক্ষেপ—এই যেমন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

এই যে কয়েকটি উদাহরণ আমি দিলাম এখানে স্বরবর্ণের নিজস্ব নির্ম্মুক্তধ্বনি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও সম্মুখবর্ত্তী ; তবে, স্বরধ্বনির সাধারণ ও স্বাভাবিক স্থান হল ব্যঞ্জনের পশ্চাতে, আড়ালে। ব্যঞ্জন দিয়েছে ঝঙ্কার কলরোল, স্বর তার মধ্যে এনে দিয়েছে বিস্তার, তান, মীড়। ব্যঞ্জন হল, বলা যেতে পারে, পৃথিবীধর্ম্মী আর স্বর হল আকাশধর্ম্মী। স্বরেরই ভিতর দিয়ে ছন্দের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। এমন কি মধুসূদনেরও ব্যঞ্জন-বহুল যুক্তবর্ণভারাক্রান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, ব্যঞ্জনের স্পষ্ট মুখরতার অন্তরালে স্বরবর্ণের সূক্ষ্মতর রেশ ও প্রতিধ্বনি স্পন্দিত হয়ে চলেছে।

ছন্দের মূল কাঠাম, তার অঙ্গবন্ধ—যাকে বলা যেতে পারে তাল —নির্ণীত হয় পদবিভাগে বা পর্ব্বে (ইংরাজী বা গ্রীক-লাতিনের foot), এ কথা পূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু এ হল ছন্দের প্রধান বা মোটা মোটা তরঙ্গ-লাস্য—তার সূক্ষ্মতর স্পন্দন নির্ভর করে ক্ষুদ্রতর পদাংশ বা আদি পদাংশের উপর। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বাংলায় এ রকম আদি পদাংশ দুই ধরনের এবং তারা এনে দেয় ভিন্ন চাল—সম আর অসম অথবা দুই আর তিন মাত্রার চাল। বাংলা ছন্দস্পন্দের একটা মূল রহস্য এখানে এবং তাল সমান হলেও তাতে দোলের বৈচিত্র্য আসে এই দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের—

শুধু কি। মুখের। বাক্য। শুনেছ। দেবতা

হল প্রধানত তিনের চাল। কিন্তু বৈচিত্র্যের জন্য এর পরের পংক্তিটি

শোন। নি কি ॥ জন। নীর ॥ অন্ত। রের ॥ কথা।

হল দুয়ের চাল। আবার

ঐ। আসে। ঐ ॥ অতি। ভৈ। রব ॥ হরষে···
ঘন। গৌ। রবে ॥ নব। যৌ। বনা ॥ বরষা—

এখানেও দুএর চাল। প্রতি পংক্তির শেষ পর্ব্বটি—হরবে, বরষা—তিন মাত্রা এবং তিনের চাল বাহৃত। কিন্তু আবৃত্তিকালে আমরা "হরষে", "বরষা"র শেষ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ করে পড়ি এবং দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে থাকি —যেমন "ঐ", "ভৈ", "গৌ"এর দুই দুই মাত্রা—তা হলে এটিও চার মাত্রা এবং দুই এর চাল।

এক হিসাবে দেখান যেতে পারে ইংরাজীতেও (এবং গ্রীক লাতিনেও) আছে এই রকম দুই বা তিনের চাল, অর্থাৎ সহজ কথায় যে বলা হয়, প্রতি ফুট দুই বা তিন সিলেব্‌লে গঠিত। কিন্তু প্রথম কথা, বাংলায় যে দুই বা তিন মাত্রার চাল সেই দুই বা তিন মাত্রা দিয়ে সব সময় পর্ব্ববিভাগ নির্দ্দেশ হয় না। সাধারণত পর্ব্বের জন্য প্রয়োজন দুই বা তিনের গুণিতক চার বা ছয়। বস্তুত বাংলা পর্ব্বের সঙ্গে ইংরাজী ফুট সকল সময় মিলিয়ে ধরা

যায় না। বাংলার পর্ব্বে পর্ব্বে যে ছেদ বা যতি তাকে caesura বলতে হয়, ফুটএর ছেদ অতখানি যতির অপেক্ষা রাখে না। তারপর, রবীন্দ্রনাথ যেমন দেখিয়েছেন—যে দুই মাত্রায় যেন দেয় একটা গোটা আবর্ত্ত বা ঢেউ, তারপরে পূর্ণতর ছেদ; কিন্তু তিনের মাত্রা অসম্পূর্ণ, তার পূর্ত্তির জন্য প্রয়োজন আরও তিন মাত্রা। দুই এর মাত্রা দেয় স্থিতি—তিনে গতি। বাংলায় অযুগ্ম মাত্রার পদ অবশ্যই হয়, কিন্তু সেটি কেমন যেন তার অস্থিতির অনিশ্চয়তার অবস্থা। ইংরেজীর চেয়ে এখানেও বাংলার সাদৃশ্য বরং দেখি ফরাসীর সাথে। ফরাসীতেও ইংরাজীর মত ফুট বিভাগ নাই, আছে বাংলার মত পর্ব্ববিভাগ; আর তারও চাল দুই-এর ও তিনের—প্রধানতই দুই-এর, তিনের চালকেও দুই-এর চালে কেটে কেটে আবৃত্তি করা হয়—বিশেষতঃ গানে। দুই এর চাল (যথা, তাদের জাতীয় সঙ্গীত)

Allons। enfants। de la। patrie

তিনের চাল

Aux armes। citoyens।
Formez vos। bataillons।

কিন্তু আমরা বলছিলাম বাংলায় স্বরকে টেনে দীর্ঘ করবার রীতি। এ কথা থেকে আমরা বাংলা ছন্দের মণিকোটায়, যাকে গোড়ায় আমি বলেছি অন্তস্তমাঙ্গ তার মধ্যে এসে পড়লাম। বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বর বিভাগ নাই অর্থাৎ হ্রস্ব স্বর হ্রস্বই, দীর্ঘ স্বর দীর্ঘই এ রকম সুনিশ্চিত নিয়ম এখানে নাই, যেমন সংস্কৃতে বা গ্রীক লাতিনে আছে—এই চলিত সিদ্ধান্তটি আমরা ধরে নিয়েছি, তাতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আনা দরকার। হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর হয়ত নাই, কিন্তু বাংলায় আছে হ্রস্বদীর্ঘ সুর—এ জিনিষটি ছাড়া কোন ভাষাতেই বোধ হয় তান-বৈচিত্র্য হতে পারে না। এই হ্রস্ব বা দীর্ঘ সুর আমরা দিয়ে থাকি অর্থ অনুসারে, ভাব অনুসারে, ভঙ্গী অনুসারে, দোল অনুসারে, অর্থাৎ ছন্দ অনুসারে। এই হ্রস্বদীর্ঘ সুর আছে বলে, তাকে একটা কিছু

ছাঁচে ঢেলে বিশেষ রূপ দেওয়া যায় বলে, লঘুগুরু ছন্দ বাংলায় কৃত্রিম নয়, পায় একটা সহজ স্বাভাবিক গতি। তবুও বলতে হবে বাংলা শব্দের মূল বৈশিষ্ট্য, তার সাধারণ প্রকৃতি হল হ্রস্বদীর্ঘের বাঁধানিয়ম হতে মুক্তি, ধ্বনির লীলায় তার স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি স্বেচ্ছাচার।

বাংলা ছন্দের একটা নিভৃত রহস্যই ইচ্ছামত হ্রস্বকে দীর্ঘ করা, এবং এই উপায়ে একটা তান বা সুর বিস্তার। যখন আবৃত্তি করা হয়

পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক—

এখানে নদী, তীর, বেণীর দীর্ঘ ঈর দীর্ঘ উচ্চারণ ইচ্ছাসাপেক্ষ—তবে "তীরে" দীর্ঘ উচ্চারণ করলে শ্রুতিসৌষ্ঠবের জন্য পরের পংক্তির হ্রস্ব "শি"-কেও দীর্ঘ করতে হয়। "শিখ" "নির্ভীক" সম্বন্ধেও ঐ এক কথা—"শি" হ্রস্ব "ভী" দীর্ঘ—আবৃত্তিতে দুটিকেই হ্রস্ব বা দুটিকেই দীর্ঘ করতে পারা যায়। "এ"কার সবও ঐ রকম ইচ্ছামত কোথাও হ্রস্ব, কোথাও দীর্ঘ করে পড়া যায়। এই সব হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রা গণনার মধ্যে আসে না, এদের কোন নিয়ম নাই, অথচ ছন্দের একটা সূক্ষ্ম স্পন্দ বা দোল বা সুর এদের থেকে উঠছে।

বাংলা কবিতা আমরা পড়ি—ছন্দের দোল দেখাবার জন্য—সুর করে; ইংরাজী কবিতা সে ভাবে পড়া চলে না। এর কারণ হতে পারে যে বিশেষ ভাবে প্রাচ্যে এবং প্রাচীনকালে ন্যূনাধিক পরিমাণে সর্ব্বত্রই কাব্য ছিল সঙ্গীতমূলক—কবিতা রচিত হ'ত গানের জন্য। স্কুলে বাংলার অনুসরণে ইংরাজী কবিতাও সুর Sing-song করে পড়বার জন্য আমরা অনেকেই হয়ত তিরস্কৃত হয়েছি। তবুও ইংরাজীতে ও-ধরণের সুর না

থাকলেও আছে একটা modulation—স্বরবিভঙ্গ—ফরাসীরা আবার সেটুকু পর্য্যন্ত বর্জ্জন করে কবিতা আবৃত্তি করে যথাসম্ভব গদ্যের মত সাদাসিদা ভাবে। কিন্তু ফরাসী কাব্য-ছন্দের মধ্যেও অবশ্যই আছে তাদের সুরের অনুরূপ একটা বিশেষ স্বরলীলা।

ফলত সব কবিতার অর্থাৎ ছন্দের ধর্ম্মই এই তান বা সুর বা স্বর—তবে তার ধরণ বিভিন্ন হতে পারে বা কম বেশী পরিস্ফুট হতে পারে। গান গাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গায়ক যেমন একটু গুণগুণ করে নিয়ে থাকেন (অন্ততপক্ষে "মনে মনে"), আমি যে তান বা সুরের কথা বলছি তা ছন্দের পক্ষে হল এই গুণগুণ। এর মানে যন্ত্র বাঁধা—যেখান থেকে যে চালে ছন্দ চলবে সেখানে সেই ভঙ্গী নিয়ে ধ্বনিকে উঠে দাঁড়ান। এ জিনিষের বিশ্লেষণ হয় না—কেবল অনুভবগম্য।

এরও আগে আছে। কারণ ছন্দের দোল এসেছে আরও দূরবর্ত্তী লোক থেকে—কিন্তু বিশ্লেষণের সীমা এই পর্য্যন্ত। এর পরে যা তা হ'ল অবাঙ্‌মনসগোচর, ব্রহ্মের মত—সুতরাং আলোচনা-বহির্ভূত। ছন্দ মূলত স্বরূপত কি? শ্রীঅরবিন্দের কথায় বলতে পারি—Some one dancing upstairs.

কবিত্বের একটি সূত্র

পল ভালেরী বলছেন, কবিরা কানে কথা বলে আর মুখে কথা শোনে।* কবির কবিত্ব যে একটা ইন্দ্রজাল তা আমরা সকলেই জানি ও মানি, কিন্তু তাই ব'লে ও-জিনিষ কি এই রকমের একেবারে উল্টাপাল্টা আজগুবি ব্যাপার?

পল ভালেরী আধুনিক কালের একজন খ্যাতনামা ফরাসী কবি ও মনীষী। তাঁর বৈশিষ্ট্য হ'ল কঠোর চিন্তাশীলতা, প্রখর যুক্তিপ্রিয়তা। তাঁর কবিতা পর্য্যন্ত দারুণ চিন্তাভারগ্রস্ত—দার্শনিক তত্ত্বে, তর্কবুদ্ধিগত জিজ্ঞাসায় সিদ্ধান্তে কণ্টকিত। কথাটি অনেকখানি সত্য—কিন্তু সবটা নয়। ফরাসী চিন্তাশীলতায় সর্ব্বদাই সংযুক্ত চিত্তের অনুভববৈদগ্ধ, সুকুমার স্পর্শালুতা। চিন্তায় যার থৈ পাই না, চিত্তের পিছন-দুয়ার দিয়ে তা এখানে সহজে এসে ধরা দেয়। ভালেরীর বেলাতেও তাই ঘটেছে দেখি। তিনি বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্কগত যুক্তি প্রমাণ পায় না যে কবিতার প্রেরণা একটা অতিলৌকিক জগতের কিছু ব্যাপার—তিনি মনে করেন কাব্যের উত্থান ও স্থিতি এবং লয় সবই মস্তিষ্কের সীমানার মধ্যে। অথচ তাঁর কাব্যে বস্তুতঃ অনেক ইঙ্গিত আভাস পাওয়া যায় মস্তিষ্কাতীতের—যদিও ও-জিনিষটিকে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন চেপে দাবিয়ে পিছনে টেনে রাখতে।

---

* Dans le poète
L'oreille parle,
La bouche écoute...

কবিত্বের একটি সূত্র

ভালেরী কবিত্বের যে সূত্র দিয়েছেন তাতেই প্রমাণ তিনি আসলে সকল কবির মতই চিন্তাপন্থী নন, চিত্তপন্থী—সূক্ষ্ম-নিগূঢ়-চিত্তপন্থী। দেখা যাক তবে তাঁর মন্ত্রটির বোধগম্য অর্থ কিছু হয় কিনা। কবিতা দুটি অঙ্গ নিয়ে। কবিতা হ'ল কথার ব্যাপার—কথা গেঁথে গেঁথেই কবিতা। আর কথার সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে অনিবার্য্য-ভাবে জড়িত সম্বন্ধ দুটি বৃত্তি দুটি ইন্দ্রিয়—সুতরাং কবিতা, কবিতার আকার ও প্রকার নির্ভর করে এই দুটির উপর—তা হ'ল শ্রবণ ও ভাষণ, কান ও মুখ। কবি কথা বলেন আর শ্রোতারা শোনেন, এটি স্থূল শ্রম-বিভাগ। কবি নিজে-নিজেই কথা বলেন ও কথা শোনেন। প্রথমতঃ তিনি স্থূল মুখে বলেন ও স্থূল কানে শুনে রচনার সৌষ্ঠব বিচার বা অনুভব করেন। দ্বিতীয়ত স্থূল মুখ ফুটে বলবার আগে তিনি কথা শুনে থাকেন দিব্য-কর্ণে। আবার এমনও বলা যেতে পারে আগে হয় দিব্য উক্তি—সূক্ষ্ম ভাষণ, অশরীরী বাণী, কবি তাই কান পেতে শোনেন। তবে আসলে ও-দুটি বৃত্তি—সূক্ষ্ম হোক আর স্থূল হোক—যুগপৎ চলে, এবং উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভর করে।

স্থূল মুখে কথা বলা ও স্থূল কর্ণে শোনা, এ হ'ল সাধারণ মানবের প্রাকৃত লৌকিক ধর্ম্ম—এ ব্যাপারের মধ্যে চমৎকারিত্ব কিছু নেই। কবি কথা বলেন ও কথা শোনেন সূক্ষ্ম কণ্ঠ ও সূক্ষ্ম শ্রবণ দিয়ে। এটুকু সহজে স্বীকার করা যায়—কিন্তু ভালেরী তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি বলছেন জিনিষ কেবল সূক্ষ্ম হ'লেই চলবে না। জিনিষের মধ্যে চাই একটা বিপর্য্যয় বৈপরীত্য—তবে না তা কবিত্বের পদবীতে উঠে দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়াতীত নয়, প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে—"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর" এই রকম একটা কিছু। কবিচেতনার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাতেই জন্মে কবিত্বের ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিক।

এমন এক চেতনা আছে যেখানে সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি এক হয়ে মিশে আছে। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে যে পার্থক্য যে বৈশিষ্ট্য তা বাহ্য স্থূল চেতনার

কথা—যত অন্তরে ও সূক্ষ্মে চলে যাই তত দেখি ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে একান্ত পার্থক্য আর নেই। সেই স্তরের অনুভূতি নিয়ে মুখ সহজেই শুনতে পারে, কানও বলতে পারে কথা। উপনিষদ্ ঐ জিনিষটিকেই লক্ষ্য ক'রে বলেছে "যৎ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ"। তাই ত আমাদের ঋষিদের বলা হয় মন্ত্র-শ্রোতা নয়, মন্ত্র-দ্রষ্টা। আর ঠিক এখানে চেতনার যে একটা বিপর্য্যয় ঘটে যায় তাকেই ইঙ্গিত করে শ্রুতি বলছে বৃক্ষের মূল রয়েছে ঊর্দ্ধে আর তার শাখা-প্রশাখা প্রসারিত নীচের দিকে।

তবে অবশ্য ঔপনিষদ যে ব্রাহ্মী চেতনা তাকেই কবিচেতনা ব'লে গ্রহণ করলে ভুল হবে। আদিতে কবি কথাটির ঐ অর্থই ছিল এবং কবির ধর্ম্মও ছিল তাই. কিন্তু সে ছিল সত্যযুগে—অর্ব্বাচীন যুগে কবির সংজ্ঞা অনেকখানি লৌকিক ও লোকায়ত হয়ে গিয়েছে। অন্য কথায়, কবি তার ব্রাহ্মী স্থিতি হ'তে অনেকখানি নেমে এসেছেন, কিন্তু তবুও বজায় রেখেছেন এই ইন্দ্রজাল-শক্তিটি—বস্তুর ঊর্দ্ধতম উৎসে তিনি একান্ত যদি নাই যেতে পারেন তথাপি তিনি অন্ততঃ প্রবেশ করতে পারেন তির্য্যক্‌ভাবে এমন একটা প্রচ্ছন্ন লোকে যেখানে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের মূল আদি একত্ব তখন দেখা না দিলেও সেখানে আছে তাদের মধ্যে একটা ঐক্য, নিবিড় সংযোগ ও মুক্ত গতায়াত—এই হেতু এখানে সম্ভব ইন্দ্রিয়ের বিপরীত ব্যবহার। কবির কথা তাই কেবল ধ্বনি বা শব্দতরঙ্গ নয়, তাতে আছে সত্য-সত্যই রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ পর্য্যন্ত। কবির কথা এই জন্যেই প্রাণ-হীন জড় বর্ণসমাহার মাত্র নয়—তা জীবন্ত, যেন রক্তমাংসে গড়া দেহটি।* কবির কথা, কথার ধ্বনি কেবল কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে

---

* ফরাসী কবি Rimbaud তাই প্রত্যেক স্বরবর্ণের দিয়েছেন এক একটি রং—এক একটি ধ্যানমূর্ত্তি—

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles !

না, মরমে পশিবার সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই কেমন চারিয়ে যায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে—সকল ইন্দ্রিয়ই সাড়া দিয়ে ওঠে—তাদের আপন আপন ভোগ্য পেয়ে।

যা হোক, বলছিলাম ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-বিপর্য্যয়ের কথা। এক হিসাবে কাব্যের ও গদ্যের পার্থক্যটি এই সূত্র দিয়ে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। গদ্যের ছন্দ ও রূপ হ'ল সহজ জীবনের, ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধারার অর্থাৎ কানে শোনা ও মুখে বলার ছন্দ ও রূপ। এই নিত্যনৈমিত্তিক গতির ছাঁচ ও ঢঙ যত মার্জ্জিত সুকুমার সুললিত হোক না তা থেকে যাবে গদ্যের পর্য্যায়ে—গদ্য-পদ্য বা পদ্য পর্য্যন্ত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু হবে না কাব্য। কাব্যের আবির্ভাব ঠিক তখনই যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই বৈপরীত্য ঘটেছে—কানে আর শোনে না, কানে কথা বলে, মুখে আর কথা বলে না, মুখে কথা শোনে।

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥—

সুললিত অনুপ্রাসাদি সত্ত্বেও এ গদ্যধর্ম্মী, তবে কিছু মাজাঘষা সাজান-গোছান, এই যা পার্থক্য। কিন্তু

ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া—

এখানে রয়েছে ইন্দ্রিয়বৃত্তির বিপর্য্যয়। তবে এই উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে বিপর্য্যয়ের ফল এমন নয় যা কেবল হেঁয়ালি বা প্রলাপ। বিপর্য্যয়ের আসল অর্থ এই, কথার ধ্বনির পিছনে সূক্ষ্ম অনুরণন প্রসারিত হয়ে গিয়েছে এমন একটা লোকে—মুখর মুখ যেখানে মূক স্তব্ধ হয়ে শুনছে শুধু, আর শ্রবণ বাহ্যস্পর্শের অবশ প্রতিলিপি-মাত্র শ্রোতা-মাত্র না হয়ে, হয়ে উঠেছে

বক্তা, সেই ভিতরকে বাহিরে ফুটিয়ে ধরেছে—কানের ও মুখের এই রকমের একটা ধন্যান্তর রূপান্তর হয়েছে। অবশ্য আধুনিক এক শ্রেণীর কবি ঠিক এই কথাই বলতে, এই কাজই করতে চেয়েছেন যে বাক্য যতক্ষণ sense ছেড়ে nonsense না হয়ে উঠছে ততক্ষণ কাব্য হয় নাই। এ রকমটি ঘটে ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হয়ে যথেষ্ট গভীরে যদি না চ'লে গিয়ে থাকে—সেই গভীরের আগে অবধি, একটা স্বপ্নময় জগতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির যদি অদল-বদল ঘটে তবে তাতে এনে দেয় কেবল ব্যামিশ্রতা, নিরর্থকতা—প্রলাপ, সংলাপ নয়।

সত্যকার বিপর্য্যয়ের ফল উদ্ভট হয় না, হয় চমৎকারী। তবে এই বিপর্য্যয়ের নানা পর্য্যায়—শ্রেণী স্তর ক্রম—থাকতে পারে, স্থূল থেকে সূক্ষ্মে, কাঠামো থেকে অন্তরাত্মায়। বিদ্যাপতির যে চরণ উপরে উদ্ধৃত করেছি তাতে বিপর্য্যয়ের লক্ষণ কাঠামোতে ধরা কিছু দেয় নি—কাঠামো ঠিক সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুগতই রয়ে গেছে। কিন্তু শুনুন রবীন্দ্রনাথের—

তব স্তনহার হতে নভস্থলে খসি পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

এখানে যে চমৎকারের অনুভব হয় তার মূল কারণটি এই নয় কি যে এখানে কবির কি যাদুর ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আর পৃথক নয়, সব গ'লে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে (দুরন্ত বরষা কালের মত!) এবং একটা অখণ্ড ইন্দ্রিয়-সমবায়ে ঘটেছে অপ্রত্যাশিত সংযোগ সমন্বয়?

বাহ্যতঃ বিপর্য্যয় আরও স্পষ্ট হয়েছে অনেক আধুনিকের মধ্যে—আধুনিকতার প্রধান একটি লক্ষণ এই। শুনুন আমাদের এক আধুনিককে

তবে—

সে এক স্বপন আঁখি
নৈঃশব্দ্যের দীপ্তরেণু মাখি
প্রথম প্রভাতে
আলোকের ধ্যানময় স্বর্গভৃঙ্গ সাথে
কানে কানে
ধরণীরে শুনাইল কি যে বাণী মধুমাখা গানে
সেই হতে অজানা সঙ্গীত
আঁধার সাগরে সৃজে কুসুম লোহিত।

ইন্দ্রিয়বৃত্তির মধ্যে অদল-বদল ঠিক নয়, তবে একটা অনুরূপ ব্যাপারের উল্লেখ কোলরিজ ক'রে গিয়েছেন তাঁর "ইমাজিনেশন" ও "ফ্যান্সি"র সুবিখ্যাত তুলনায়। দেশে কালে অন্তরিত, বিষয়ের হিসাবে অসম্বদ্ধ বস্তুর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, নূতন নূতন ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা, অভিনব একত্ব ব্যক্ত করা যে-বৃত্তির সহজ ধর্ম্ম তাকেই কোলরিজ নাম দিয়েছিলেন "ইমাজিনেশন", কবি-কল্পনা। আর যে-বৃত্তির সে ক্ষমতা নাই, যে চলে ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে একটির সঙ্গে তার সন্নিহিত বস্তুটি যোগ ক'রে ক'রে, যার মধ্যে আকস্মিক অপ্রত্যাশিত কিছু নেই, তারই নাম "ফ্যান্সি"। আমরা প্রায় বলতে পারি এই শেষোক্ত বৃত্তিটি হ'ল পদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী হ'ল "ইমাজিনেশন"। কবি যে অভূতপূর্ব্ব যোগাযোগ সব সাধন করতে পারেন, তার কারণ আমরা বলেছি তাঁর চেতনা, তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতি একটা অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তি—একান্ত স্থূলের মধ্যে রূঢ়ের মধ্যে এসে পড়ে জমাট কঠিন ব্যষ্টিধর্ম্মী হয়ে পড়েনি, তার আছে নিভৃতের সূক্ষ্মের তারল্য ও সাধারণ গুণ। সেখানে অভিনব যোগ এবং অভিনব অযোগ (বৈপরীত্য ও বিপর্য্যয়) স্বাভাবিক—এই গুণেই সেই চেতনার পরিচয় এবং সেই চেতনাসৃষ্ট কাব্যের চমৎকারিত্ব।

শিল্প কথা

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই অদল-বদলের জন্যই আর একটি ব্যাপার আমরা শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য ক'রে থাকি। শিল্পে শিল্পে যে মেশামিশি হয়—যেমন কাব্যের মধ্যে, কথার গড়ন-চলনের মধ্যে কখন দেখি সঙ্গীতের প্রভাব, কখন চিত্রের কখন ভাস্কর্যের কখনও বা স্থাপত্যের—তার হেতুও ঠিক এইখানে। শেলী-ভেরলেন সঙ্গীতময়, গোতিয়ে (আমাদের কালিদাস-ও) চিত্রময়—রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতময় চিত্রময় উভয়ই—বোদেলের কথায় ভাস্কর, মিলতন ভর্জ্জিল স্থপতি।

আরও আমরা দেখতে পারি কাব্যের ইতিহাসে যুগে যুগে যে যুগান্তর বা নবজন্ম হয়েছে তা ঘটেছে নিভৃত চেতনার এই বিপর্যয়-পটীয়সী বৃত্তিটির নব আবির্ভাবের ফলে, এবং এই বিপর্য্যয় যত সুষ্ঠু, গভীরতর হয়েছে—নবসৃষ্টিও তত চমৎকার হয়েছে। ইউরোপে রেণাসেন্সের যুগ, তার পর রোমান্টিক যুগ, তার পর ইমপ্রেশনিজম্-এর যুগ এবং শেষে আধুনিক যুগের প্রচেষ্টা, কয়েকটি যুগান্তরের ক্রম। আমাদের দেশেও এই ধরণের ক্রম নির্দ্দেশ করা যায়—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক উদ্যোগ।

লোকোত্তর চেতনার কবিতা

ঊর্দ্ধতর—মানসোত্তর চেতনা থেকে সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ উঠেছে কেন? অবশ্য এমন একটা ভূমি আছে যেখানে সাহিত্যসৃষ্টি কেন, কোন সৃষ্টিই সম্ভব নয়—যার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি, অক্ষর ব্রহ্ম, নির্ব্বাণ, লয়। কিন্তু তা ছাড়া যেখানেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, সেখানে সাহিত্যসৃষ্টিরও অবকাশ রয়েছে। সাহিত্য কি? সত্যের সৌন্দর্য্যময় রূপ—বাক্যের আধারে। এই যে সুন্দর বাঙ্‌ময় রূপ—তা কেবল নিম্নতর সত্যের নয়, ঊর্দ্ধতর সত্যেরও থাকতে পারে। আপনি হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন মর্ত্ত্য, মানুষী বাক্য কতখানি প্রকাশ করতে সক্ষম অমানুষী অমর্ত্ত্য সত্যকে সৌন্দর্য্যকে। আমার মনে হয় মানুষের ভাষা যতই সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ হোক না—যদিও বাক্‌ব্রহ্ম বলে একটা জিনিষ আছে—শিল্পীর হাতে তার এমন একটা রূপান্তর ঘটে যায় যাতে অলৌকিক লোক সবও ধরা পড়ে। কবির কবিত্বই এখানে।

ঊর্দ্ধতন চেতনাসৃষ্ট কাব্যের উদাহরণ আপনি চেয়েছেন। কেন—উপনিষদ কি, গীতা কি? উপনিষদের

তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্‌
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি

লোকোত্তর চেতনার কথা—লোকোত্তর কবিত্বও নয় কি? গীতার

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—

জানি না, এর কবিত্ব কার প্রাণমনকে উদ্বেলিত করে তোলে না।
কিম্বা ধরুন বাইবেলের—

And the spirit of God moved upon the face of waters
এখানেও লোকায়ত চেতনার কথা নয়, কিন্তু কবিত্ব কি কিছু কম? ইংরেজী কাব্যে Blake এই ঊর্দ্ধতর (কি গভীরতর) domain of consciousness-এর কবি। A. E.ও তাই। এমন কি বলা যেতে পারে, এই ঊর্দ্ধতর রাজ্যে সর্ব্বতোভাবে উন্নীত না হলেও, বহু কবির মধ্যে এই রাজ্যের আভাষ, ইঙ্গিত, প্রতিচ্ছায়া বহু যায়গায় দেখতে পাই। তবে এখানে মনে রাখা দরকার higher domain বলতে একটি বিশেষ লোক বুঝায় না। মনের উপরে, অতিমানস লোক রয়েছে বহু, স্তরের পর স্তর,—ঋগ্বেদের কথায়—সানুর উপরে সানু ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠে চলেছে। এবং প্রত্যেক লোকের নিজস্ব সত্য নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, এবং তা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন কবির ভিতর দিয়ে রূপ গ্রহণ করতে পারে। জিনিষ যত গভীরের বা সুন্দরের বা অন্তরালের হয়, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা তত দুরূহ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া অনেক কবি আছেন যাঁদের হাতে এই দুরূহতা যথাসম্ভব সহজ হয়ে দেখা দেয়, আবার এমন অনেকে আছেন যাঁদের হাতে দুরূহ বস্তু দুরূহতর হয়ে প্রকাশ পায়।

আপনার অন্য প্রশ্ন, এই সব দুরধিগম্য চেতনার কাব্যসৃষ্টি আমাদের আদৌ বোধগম্য হবে কি না। জিজ্ঞাসা তবে করতে পারি, উপনিষদ বোধগম্য কি না—কাব্য হিসাবে? ফলত ঠিক করতে হবে "আমাদের" বলতে কি বুঝায়। কাব্যের রস আস্বাদন করতে হলে শিক্ষা চাই, সাধনা চাই, বৃত্তির অনুশীলন সৌকুমার্য্য চাই। যে কোন কবির সৃষ্টিকে বুঝতে হলে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, কবির সেই লোকে প্রবেশ করতে হয়। ঊর্দ্ধতর চেতনার কাব্য সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, ঊর্দ্ধতর চেতনার সঙ্গে আগে সংযোগ স্থাপন করতে ত হবেই। এই সংযোগের অভাবেই ইংলণ্ডে Blake

এতদিন অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে ছিলেন। গুটিকতক গুণী এই সংযোগের সূত্র পেয়েছেন, তাঁদেকে ধরে Blake আবার সর্ব্বজন সমাদৃত হতে চলেছেন। কিন্তু তা ছাড়া, বহুর বোধগম্য না হলেও, তাতে শিল্পের মর্য্যাদা কমে যায় না। ভগবানকে বেশির ভাগ লোকই দেখতে পায় নি, উপলব্ধি করে নি, সমাদর করে নি—ভগবান তাতে অসিদ্ধ হয়ে যান নি, ভগবানের সৌন্দর্য্য তাতে কিছু ম্লান হয় নি।

আপনি বলতে পারেন এ রকম esoteric, hermetic গুহ্য বা "কৌল" কবিত্বের সার্থকতা কি? বহুজনের প্রীতিবিধান যে করতে পারে না, তার থাকাও যা না থাকাও তাই। Mute inglorious Milton-দের দিয়ে অথবা যে সৌন্দর্য্য রয়েছে "বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি" তা দিয়ে আমরা কি করব? এখানে মনে রাখা দরকার এটা "আমাদের" দৃষ্টিভঙ্গি—আমাদের কাছে যুক্তিযুক্ত; কিন্তু এ ছাড়া "তাঁদের"-ও ত একটা দৃষ্টি-ভঙ্গি আছে। আমরা যদি সর্ব্বদা "আমরাই" থাকি—কখনও "তাঁদের" মত কিছু হয়ে উঠতে না চাই, না পারি—পরিণামে ক্ষতি হবে কাদের?

আপনার শেষ প্রশ্ন, উচ্চতর চেতনার সাহিত্য কি সাহিত্য হিসাবে নিম্নতর চেতনার সাহিত্য অপেক্ষা মূল্যে মর্য্যাদায় উচ্চতর হবেই? উত্তর অবশ্য—না, তা নয়। সাহিত্য আগে সাহিত্য হওয়া চাই, উচ্চতর হোক কি নিম্নতর চেতনার হোক। উচ্চতর চেতনা যদি দেয় কেবল উচ্চতর বিষয়বস্তু, কিন্তু সেই সাথে দেয় না উচ্চতর ভঙ্গী—তবে শিল্প হিসাবে তার মর্য্যাদা উচ্চতর হয় না। "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা"—মহাবাক্য, চরম উপলব্ধির কথা হতে পারে। কিন্তু কবিত্ব হিসাবে আমি পছন্দ করব—

Take, O take those lips away—

তবে উচ্চতর চেতনার কথা যদি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে উচ্চতর ভঙ্গীতে—তবে সে হল সোনায় সোহাগা। ঋষি হলেই যে তিনি কবি হবেন, এমন বলা চলে

না—যেমন বলা চলে না কবি হলেই তিনি ঋষি (কবি ও ঋষি আমি সাধারণ চলিত অর্থে গ্রহণ করছি)। মানসোত্তর লোকের অনুভূতি যাঁর আছে তিনি ঋষি হতে পারেন—কিন্তু সে অনুভূতি যখন তিনি মানসোত্তর ভাষায় ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করতে পারেন, তখনই তিনি কবি।

কথায় কথায় প্রায় একটা প্রবন্ধই লিখে ফেলেছি। তবে আপনার সমস্যার পূরণ হল কিনা জানি না।*

---

* জনৈক বন্ধুকে লিখিত পত্র

কাব্য ও মন্ত্র

কাব্য ও মন্ত্র এক জিনিষ নয়, সেই পার্থক্যটি আমি একটু দেখাতে চাই। কাব্য মন্ত্র হয়ে উঠতে পারে; শুধু তাই নয়, কাব্যের মন্ত্রই হয়ে উঠা উচিত, কাব্যের শ্রেষ্ঠরূপ পরাকাষ্ঠা হল মন্ত্র। আবার মন্ত্রও দেখা দিতে পারে কাব্যের আকারে কাঠামে। তবে এ সোনায় সোহাগা সচরাচর সহজে চোখে পড়ে না।

একটা লক্ষ্য করবার ব্যাপার। আমরা যখন গীতা পাঠ করি, কি উপনিষদ পাঠ করি, কি বেদসংহিতা পাঠ করি তখন যে আমরা কাব্য পাঠ করছি এ-কথা একরকম মনেই ওঠে না—আমাদের চেতনা মুখ্যতঃ কাব্য-রসের অপেক্ষা অন্য একটা রস—"ব্রহ্ম-রস" বলব কি ?—উপভোগ করে। তার প্রমাণও এই যে কাব্যের কবিত্বের উদাহরণ যখন দেওয়া হয় তখন বেদ-উপনিষদ-গীতা বড় উল্লেখ করা হয় না, উল্লেখ করা হয় ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি। অথচ বস্তুতঃ গীতা কি উপনিষদ কি বেদ-মন্ত্র হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের পর্য্যায়ে—কাব্য-নামক যে-কোন সৃষ্টি, প্রাকৃত বা লোকায়ত যে-কোন রস-রচনা, কবিত্বের মর্য্যাদায় এদের ছাড়িয়ে যায় না, আদি কবি বাল্মীকিও নয়, হোমর-সেক্সপীয়রও নয়। একটা কথা আছে শিল্প-সৌন্দর্য্য যত উচ্চস্তরের তত সে নিজেকে লুকিয়ে রাখে—the highest art is to conceal art—বেদ-উপনিষদ গীতার কবি যে ভাবে আত্ম-গোপন করে রয়েছেন এমন কবি-আখ্যায় পরিচিত কবিরা সহজে করতে পারেন না। উপনিষদ যখন বলছে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরম্
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে—

এই ত শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এই ত পরম অবলম্বন, এই অবলম্বনের জ্ঞান হলে ব্রহ্মলোকের মহত্ব লাভ হয়—

অথবা গীতা বলে যখন

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ

দুঃখে মন যার নিরুদ্‌বেগ, সুখে যার আর স্পৃহা নাই—

তখন কাব্যরসের দিক্ দিয়েই কবিত্বের চরম শিখরে যে আমরা দাঁড়িয়ে সে খেয়াল কি প্রথমে হয়, আদৌ হয় কি? একেই কাব্য না বলে আমি বলতে চাই মন্ত্র।

কাব্য কি? রসাত্মক বাক্য। এর চেয়ে সুষ্ঠু সংজ্ঞা কাব্যের কখন দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। স্বীকার করলাম; মন্ত্রের সংজ্ঞা তবে হল, আমি বলি, বাক্‌ব্রহ্ম। উভয়ত্রই বাক্ প্রতিষ্ঠা আশ্রয় আধার, উভয়ত্রই বলা যেতে পারে বাক্-এর মহিমা মাহাত্ম্য। তবে একটা সূক্ষ্ম সীমানা আছে, যার এক দিকে বাক্ হয়ে ওঠে মন্ত্র, আর এক দিকে সে হয় কাব্য, যতই তা সুন্দর বা মহৎ হোক না। কথাটা তবে এই। বাক্ যখন আপনাকে আদৌ জাহির করে না, তার নিজস্ব চাতুর্য্য ফলিয়ে ধরতে তৎপর নয়,—কস্তুরী মৃগের মত আপনার সৌগন্ধ্যে যখন আপনি আত্মহারা নয়—নিজের মনোহারিত্ব নয়, নিজেকে নয়, তার একমাত্র লক্ষ্য যখন হল তার অন্তঃস্থ রসবস্তু, যার মধ্যে সে প্রতিষ্ঠিত, তাতে শরবৎ তন্ময় হয়ে থাকা, তাকেই যখন সে অকুণ্ঠিতভাবে নির্দোষভাবে প্রকাশ করে এবং অতি সহজভাবে এ কাজ করতে পারে তখনই দেখা দেয় মন্ত্র। বাক্যের ওজন যখন বেশি হয়ে পড়ে—তা যতটুকুই হোক না—তখনই তা কাব্যের পর্য্যায়ে নেমে যায়; আর বাক্যের ওজন যখন সম্পূর্ণভাবে হ'ল বাক্যের আশ্রয়ীর ওজন তখন তা হয়ে ওঠে মন্ত্র।

কিন্তু মন্ত্র বলতে যে কেবল অধ্যাত্ম-সাধনার কথা, ধর্ম্ম-তত্ত্বের কথা বুঝতে হবে তা নয়। লোকায়ত বা ঐহিক অনুভূতি উপলব্ধিকেও মন্ত্রবদ্ধ

করে প্রকাশ করা যায়। সে-অনুভূতি ও উপলব্ধির যে মূল সত্য যে নিজস্ব রসময় সত্য, বাক্য যদি হয় তারই আত্মপ্রকাশ, তারই যথাযথ বিগ্রহ, তবে সে-লৌকিক বাক্যও মন্ত্র। স্বয়ং ব্রহ্মের ব্রহ্মবস্তুর বাহন যদি না'ই হয় তবুও সে যার বাহন তাকে বলা যেতে পারে ব্রহ্ম-সহোদর, "তটস্থ" ব্রহ্ম, উপ-ব্রহ্ম।

সেক্সপীয়রের বিখ্যাত :—

And in this harsh world draw thy breath in pain

কি দান্তের :—

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate

অথবা বাল্মীকির

অপহৃত্য শচীং ভার্য্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্।
ন চ রামস্য ভার্য্যাং মামপনীয়াস্তি জীবিতম্॥

এ সব বাক্যে আধ্যাত্মিক কথা বলতে আমরা যা বুঝি তা কিছু নাই, এখানে রয়েছে তোমার আমার মত সহজ সাধারণ মানুষেরই কথা, তবুও এদের নাম দেব মন্ত্র—কারণ বাক্য এখানে অনুভূতি-উপলব্ধির, রসবস্তুর যেন নিজস্ব দোল ও রোল—মণ্ডন নয়, পরিচ্ছদ বা পোষাক নয়, তা এমন স্বচ্ছ এমন বাহুল্য-বর্জ্জিত,—বেশি নয়, কমও নয়—এতখানি প্রয়োজন-নিয়ন্ত্রিত যে বস্তুর সঙ্গে সে রয়েছে মিলে ও মিশে, অঙ্গীভূত একীভূত হয়ে। তাই ত মন্ত্র বস্তুকে করে আহ্বান, করে প্রকট, করে মূর্ত্ত। মন্ত্রে বাক্য তার স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাখে নাই, আপনাকে সম্পূর্ণ অনুগত করে দিয়েছে বাক্যাতীতের কাছে! এক দেহ আছে আধার আছে, নিজের স্বকীয়তাকে বজায় রেখেছে, দেহীর আধেয়ের আত্মার সে-প্রকাশ গৌণভাবে, আপনাকে সে যত সুন্দর সুষ্ঠু করে তুলুক না—তা অজ্ঞানাত্মক ও মরধর্ম্মী; গ্রীক ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য এই স্তরের, গ্রীকেরা জীবনেও এই সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব চেয়েছে। কিন্তু আর এক দেহ আর এক আধার আছে যা নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে হয়ে

উঠেছে অমরত্বের বাহন ও বিগ্রহ—আমার মনে হয় ভারতীয় ভাস্কর্যের হল এই রহস্য। এবং ভারতের অনেক আধ্যাত্মিক-সাধনার লক্ষ্যও ছিল এই অমরত্ব, অলৌকিক শারীর-সিদ্ধি। সে যা হোক—বলছিলাম বাক্-এর অব্যর্থ পরিমাণ ও মাত্রার কথা।

কালিদাস বড় কবি—শ্রেষ্ঠদের পর্য্যায়ে তিনি। এ আসনের তিনি উপযুক্তই। তবুও মোটের উপর মনে হয় ঔপনিষদ কবির মত তিনি মন্ত্র-স্রষ্টা বা ঋষি নন, তিনি কবিই। তিনি যখন বলছেন—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্—

তখন আমরা চমৎকৃত হই, বলি বাঢ়ম্—তবুও এ জিনিষ সে জিনিষ নয় যা সকল প্রশংসা-স্তুতির সকল সমঝদারির বহির্ভূত, যার সম্বন্ধে বাক্ স্তব্ধ চেতনা সমাহিত—ভাবৈকরসং মনঃ স্থিরং। কালিদাস নিজেও এ ধরণের মন্ত্র যে উচ্চারণ করেন নাই তা নয়—শুনুন—

সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্

ভাষা এখানে ভাবের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে এক হয়ে রয়েছে যে তার পৃথক মাহাত্ম্য অস্তিত্ব এক রকম অনুভবই করি না। বাক্যের নিরাভরণ স্বচ্ছ ঋজুতা রসবস্তুকে যেমন সহজে অবাধে গোচর করে ধরেছে তা সম্ভব কেবল মন্ত্রশক্তির। কিন্তু আমি বলছিলাম কালিদাসের সাধারণ, মোটের উপর ধারার কথা।

ম্যাথু আর্ণল্ড কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্বন্ধে একটা কথা বলে গিয়েছেন আমরা সকলেই জানি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিত্ব যেখানে পেয়েছে পরাকাষ্ঠা সেখানে অনুভব হয় যেন কবি অন্তর্হিত হয়েছেন, প্রকৃতি স্বয়ং এসে লিখে দিয়ে গিয়েছেন। আমি বলতে চাই, সকল মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল এই

অপৌরুষেয়তা, এই নির্ব্যক্তিকতা। সৃষ্টির মধ্যে যতক্ষণ রয়েছে ব্যক্তিগত অস্মিতার ছাপ ততক্ষণ স্রষ্টা মন্ত্রকৃৎ ঋষি হয়ে উঠতে পারেন নাই—তিনি কবি হয়েই রয়েছেন। কবি যেখানে কবি শিল্পী মাত্র—তার অধিকন্তু কিছু নন—সেখানে কবি হিসাবে তিনি সজাগ সজ্ঞান, আপন কৃতিত্বের কথা তিনি সহজে ভোলেন না,—তাই ত ভবভূতি গর্ব্ব করে বলতে পেরেছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

আমাকে যাঁরা অবজ্ঞা করে থাকেন তাঁদের জ্ঞান যাই হোক না আমার এই প্রয়াস তাঁদের জন্য নয়, আমার সমানধর্ম্মা কেউ আছে হয়ত কোথাও, আর না হয় ভবিষ্যতে জন্ম নিতেও পারে, কারণ কালের ত শেষ নাই, পৃথিবীও বিপুল।

মিলতন কি ভর্জ্জিলকে আমরা এ হিসেবে কবি পর্য্যন্তই বলতে পারি —তার বেশি নয়। মিলতন কি ভর্জ্জিল কি কালিদাসেরও উপরে যাঁরা সেক্সপীয়রকে কি হোমরকে কি বাল্মীকিকে স্থান দিয়ে থাকেন তাঁদের সিদ্ধান্ত এই বোধটির উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রের ভাষা ধার করে বলা যায়, এক শ্রেণীর কবিকণ্ঠে মুখরিত "বৈখরী" বাক্, আর এক শ্রেণীর কণ্ঠে প্রকট "পশ্যন্তি" বাক্।

ঋষি (বা ঋষি-কবি) আর কবি (বা কবি-কবি) পৃথক্, তাঁদের বাক্-ধারা পৃথক বলে। বৈখরী হল বাক্ যেখানে নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তার আপন পৃথক্ মর্য্যাদা ও মাহাত্ম্য বজায় রেখেছে, ধ্বনির স্বাধীন নৈপুণ্য ফলিয়ে ধরবার লোভ সম্বরণ করে নাই। তাই অন্তরাত্মা, সত্যকার রসময় পুরুষ সে কল-রোলে সকল সময়ে সন্তুষ্ট হয় না—হ্যামলেটের মত বলে ওঠে—words words words—কি জয়দেবের মত—মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং—

কিন্তু পশ্যন্তি বাক্ হল এই অন্তরাত্মার সহজ অনাহত বাণী, সত্যদৃষ্টির স্বকীয় চারু রশ্মিরেখা।

বাংলার কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে বৈখরী বাক্ (গৌড়ীয় রীতির জের বুঝি আমরা বরাবর টেনে চলেছি) ; পশ্যন্তি বাক্ দুর্লভ বিরল—নাস্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলায় সুন্দর কাব্য হয়েছে সন্দেহ নাই—সুন্দর কাব্য প্রচুর সৃষ্টি হয়েছেও বলা চলে। কিন্তু বাংলার ঋষি কবি কই ? রবীন্দ্রনাথ ? রবীন্দ্রনাথে কাব্যশক্তি পরম উৎকর্ষ লাভ করেছে হয়ত, কিন্তু মন্ত্রশক্তি ? রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করতে হয় আমাদের বহুল ও বিপুল কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সত্যকার আর্যবাক্য কতটি মেলে ?

নব্য কাব্য

নূতন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নূতন অনুপ্রেরণা—আধুনিকেরা এই সহজ সত্যটি মনে হয় যেন ভাল করে ধরতে পারেন নাই; নূতন প্রেরণার দিকে না গিয়ে তাঁদের মুখ্য চেষ্টা হয়েছে নূতন ধারণা, নূতন ধরণ সব সংগ্রহ করা কি আবিষ্কার করা। অভিনব চিন্তাচাতুর্য্য আর অভিনব গঠন-বৈদগ্ধ্য, এই দুটি প্রক্রিয়ার উপর তাঁরা যেন সমস্ত জোর দিয়েছেন। আধুনিকেরা পূর্ব্বতনদের ধারণা ও ধরণে বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন—ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের এক নব্য ডাক্তারের চরিত্র গড়েছেন যিনি বলে ফেলেছিলেন হৃদ্‌পিণ্ডের স্থান বুকের ডান দিকে (তিনি ছিলেন যাকে বলে 'ধরে-বেঁধে' ডাক্তার—অতটা ডাক্তারী জ্ঞান তাঁর ছিল না); আপত্তি জানালে তিনি অতি সপ্রতিভভাবেই বললেন, ও-সব হল তোমাদের যুগের কথা, আমরা ও-সব পুরাণো ব্যবস্থা একদম বদলে দিয়েছি (nous avons changé tout cela)।

কথা উঠেছে প্রাচীন কবিতা চাই না, চাই আধুনিক কবিতা। কিন্তু আধুনিক কবিতা কেবল আধুনিক হলেই ত চলবে না, তাকে হতে হবে আবার কবিতা। আশঙ্কার বিষয়, আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতাকে যে-পরিমাণে আধুনিক করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন সে-অনুপাতে তাকে কবিতা করে ধরবার আয়াস গ্রহণ করেন নাই। কবিতার মধ্যে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তা মুদ্রাদোষ—ফলিয়ে ধরতেই যেন তাঁরা বেশি ব্যস্ত এবং যিনি যতখানি এ কাজটি করতে পেরেছেন তাঁর কাব্য-সৃষ্টি ততখানি সফল ও সার্থক হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য কি, স্বকীয়তা কোথায়? একটা হিসাব দিতে আমরা চেষ্টা করব।

আধুনিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্ম-সচেতনা ও তার আনুষঙ্গিক বৃত্তি আত্মবিশ্লেষণ। আধুনিক কবি নিজের কবি-পদবী সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগ, তিনি কখনও ভুলতে পারেন না যে তিনি কবি; আরও তাঁর কবি-চিত্ত কি কি উপাদানে গঠিত এবং তাঁর কাব্য-রূপনের 'এনাটমি' কি সে-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য তিনি জ্ঞাত আছেন। তিনি সৃষ্টি করেন সব জেনে-শুনে দেখে পরখ করে, পদে পদে উদ্দেশ্য প্রয়োজন অনুসারে সব অঙ্গ উপাদান যথাযথ সুসজ্জিত ক'রে—একটা সজাগ দৃঢ় সঙ্কল্প, একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তাঁর গঠনকে বাঁকে বাঁকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। এখানে যেন অতর্কিতের, উদ্দেশ্যহীনতার স্থান নাই। প্রাচীন কবিরা সৃষ্টি করতেন একটা যেন আবেগের ভরে, একটা নিরঙ্কুশ প্রেরণার আবেগে, প্রায় আত্মহারা হয়ে—in fine frenzy rolling। প্রাচীনতর কবি-প্রতিভার সম্বন্ধে বলা চলে, the wind bloweth where it listeth—আধুনিকেরা পক্ষান্তরে বলবেন, কাঁটা কম্পাস ছাড়া পাদমেকং ন গচ্ছামি।

আধুনিক কবি কেবল আত্ম-চেতনই নন, তিনি আবার বিশ্বচেতন। কবির জ্ঞান যে কেবল তাকে নিজের সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছে তা নয়, বিশ্বের সম্বন্ধেও তাকে সজ্ঞান করেছে। ভাবে অনুভবে বিশ্বের সাথে একটা সাধারণ ঐক্যের বা সৌহার্দ্যের কথা বলছি না, মস্তিষ্কের ধারণায় চিন্তায় কবির মধ্যে প্রতিফলিত হবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্যা সিদ্ধান্ত সব। আধুনিক চিত্তকে চেতনাকে স্পর্শ করে আলোড়িত করে যত তত্ত্ব—আধুনিকেরা বস্তু-হিসাবে বস্তুকে নিয়ে আর তত তৃপ্ত নন, বস্তুকে কেটে ছিঁড়ে, তাকে বিশ্লেষণ করে, যে তত্ত্ব পাওয়া যায় কি যায় না, বস্তু যে মনোজ সমস্যার প্রতীক বা বাহন, সে-সবই কাব্যের অঙ্গীভূত হওয়া চাই, তাদের সম্বন্ধে কবির প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা চাই, তাই হল কাব্যের মুখ্য সার্থকতা।

আধুনিক কবি বিশ্বচেতনা দুই ধারায়—দেশে ও কালে ভূগোলের আর ইতিহাসের জ্ঞান আধুনিক মনকে বিচিত্র রকমে সমৃদ্ধ করেছে।

একদিকে সমসাময়িক সমগ্র ভূখণ্ড, আর একদিকে সমগ্র অতীত বিবর্ত্তন, কত প্রকার অনুভূতির উপলব্ধির আলোচনার বিষয় আধুনিক চেতনায় সঞ্চিত করেছে, স্তরে স্তরে কোষে কোষে। দেশান্তরিত, কালান্তরিত বিবিধ শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি মিলে-মিশে আধুনিক চিত্তের যে গঠন দিয়েছে তাতে আধুনিক মানুষ আত্যন্তিকভাবে—সূক্ষ্ম আকারে নয়, স্থূলতঃ কার্য্যতঃ বস্তুতঃ—হয়ে উঠেছে বিশ্ববাসী। ফরাসী শিল্পীর দৃষ্টি মুগ্ধ হয়েছে, তুলিকা স্পন্দিত হয়েছে সুদূর পলিনেশীয় প্রকৃতির, পলিনেশীয় আদিম মানুষের সৌন্দর্য্যে, প্রাগৈতিহাসিক মিশরের শিল্প রচনায় পাই যে রেখা-ভঙ্গির অপরূপ কঠোর মাধুর্য্য, তপস্বী-সুলভ নগ্নতা, দৃঢ়তা একাগ্রতা, যেন আধুনিকের মধ্যে পাই তার ছায়া। আমাদের দেশেও আধুনিকের হাতে কেবল যে সুদূর অজান্তার টান পাই তা নয়, অনেক আধুনিক কণ্ঠেও শুনি ভারতীয় সুরে ইউরোপীয় ছন্দ। অবশ্য অতীতকালে দেশে ও দেশে, যুগে ও যুগে আদান-প্রদান ও একটা মিশ্রণ যে ছিল না তা নয়—কিন্তু তা ছিল যেন প্রাকৃতিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার মত সহজ ও অনায়াস। কারণ বিদেশ হতে আগত অথবা অতীত হতে গৃহীত উপাদান-উপকরণ এতখানি আত্মসাৎ করে ফেলা হত, বর্ত্তমানের চিত্তরসায়নে এতখানি গলে মিশে যেত, যে সে-সকল আবিষ্কারের জন্য রীতিমত প্রয়োজন রাসায়নিক বিশ্লেষণ, পণ্ডিত গবেষকদের সমগ্র কলাকৌশল (critical apparatus)। আর্য্য-সংস্কৃতির কোন কোন অঙ্গ অনার্য্য বা অনার্য্যের জীবন ধারায় আর্য্যের পদাঙ্ক কোথায় কোথায়, এ সমস্যা মীমাংসা করতে গিয়ে আজ আমরা গলদ্‌ঘর্ম্ম। কিন্তু আধুনিক শিল্পী-চিত্তের গঠন দেখি অন্য রকম—এখানে বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ সকলেই তাদের পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে বর্ত্তমান। কারণ কবির অনুভবের চেয়ে কবির মস্তিষ্কেই তাদের স্থান বেশি—কবি এ-সকলকে ব্যবহার করেন সজ্ঞানে।

কবি-চিত্তের মধ্যে যত বিভিন্ন স্তর রয়েছে, ধারা রয়েছে কবি সব তা দেখাবেন, সে-সমস্তকে রেখে-ঢেকে উপর-উপর পালিশ করে দিলে চলবে না।

আমাদের চেতনা সরল রেখায় সোজা চলেনা—তা জটিল কুটিল। Joyce তাই চেতনার বিভিন্ন তন্ত্রীকে যুগপৎ ধ্বনিত করবার জন্য আবিষ্কার করলেন একটা telegraphic অথবা telescoped ভাষা, একটা সংযুক্ত ভাষা (ক+ষ=ক্ষ যে রকম)। এলিয়ট আধুনিক ইংরাজী লিখতে লিখতে হঠাৎ এলিজাবেথীয় স্মৃতির অনুপ্রেরণায় সেই যুগের ভাষা বলতে সুরু করেছেন —King's English-এর মধ্যে দেবভাষাকে অবতরণ করালেন। এজরা পাউণ্ড তাঁর 'বাক্য-বন্ধনের' মধ্যে গ্রীক ফরাসী ইতালীয় ভাষার পাঁচ-ফোড়ন ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর এ-পদ্ধতিটি হাসি-তামাসার জন্য নয়—তা রীতিমত গুরু ও গম্ভীর; তা নইলে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালও ত বলে গিয়েছেন—

From the above দেখতে পাচ্চ বেশ
যে আমরা neither fish nor flesh—

কাব্যের একটা প্রধান আশ্রয় হল তার উপমা, রূপক—Muthos; এই জিনিষটি দেয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য (local colour), জীবন্ত আবহাওয়া। কাব্যের যুগ নির্ণয় করা যায় এই অঙ্গের প্রকার-ভেদ থেকে। বৈদিক যুগের মধ্যে দেখি যাগ-যজ্ঞ, সোম-মধু, অগ্নি-মরুৎ গো-অশ্ব, দাস-দস্যুর লীলা। আবার ইউরোপে যদি যাই তবে সেখানে আর এক যুগে দেখি ফুটে উঠল প্রেমপতাকা, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, প্রণয়ের অভিযান, সৌন্দর্য্যের বিজয়—love of ladies, death of warriors। পরে আরও এক যুগে কাব্য বলতে বোঝা যেত, মলয়-জোছনা, কেকা-কুহু, আহা-উহু। বর্ত্তমান যুগও তেমনি নিয়ে এসেছে তার নিজস্ব রূপকাবলি। এটা হল লৌহযুগ (অন্তরের দিক দিয়েও)—লোহা লক্কড় কলখারখানা যন্ত্রপাতি এই সব হয়ে উঠেছে প্রকৃতির শোভা। প্রাচীনতন কবির চোখে ও লেখনীতে লেগে আছে যে স্বভাবের শোভা—তা হল, বৃক্ষরাজির, অরণ্যানীর সবুজ স্তূপ, সাগরের এলায়িত নীলিমা, সর্ব্বত্র নিটোল আকার, প্রোজ্জ্বল বর্ণগৌরব—

Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll !

অথবা, দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা

এমন কি

হে আদিজননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার…
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গ বন্ধনে বাঁধি' নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার—

এই হল প্রাচীন কাব্যের পটভূমি। আধুনিককালে প্রকৃতির অঙ্গ হতে এ-সব অবান্তর আবরণ আমরা দুঃশাসনের মত কেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করছি। প্রকৃতি অর্থ ধূলা-কঙ্কর, দগ্ধ-প্রস্তর-স্তূপ, ঊষর-মরু—বড় জোর তার মধ্যে কাঁটা-গুল্ম ফণী-মনসা—প্রত্যাখ্যাত আবর্জ্জনা—

Rocks moss, stone-crop, iron, merds

(Eliot—Gerontion)

মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্য বলতে আমরা যা বুঝতাম এক সময়ে রক্তের মাংসের পেশীর সামর্থ্য ও শ্রী—

ব্যূঢোরস্কো বৃষঃস্কন্ধ

অথবা,

দুর্ব্বহশ্রোণিপয়োধরার্ত্তা

এখন সে-সমস্ত হয়ে উঠেছে আবরণ আচ্ছাদন মায়ার ফুলঝুরি। আধুনিক কবি নাগা-সন্ন্যাসীরও অধিক—ভূষণের ত বালাই নাই, বসনকেও ত্যাগ করতে হবে—কেবল তাই নয় (কারণ ও-কথা পুরাণো অনেক রসিক কবিই বলে গেছেন), দেহের অবান্তর উপকরণ—বাহার—বাদ দিয়ে পৌঁছিতে হবে একেবারে হাড়ের কাঠামটিতে :

White bodies naked on the low damp ground
And bones cast in a little low dry garret

(Eliot—The Waste land)

শুকনো হাড়ের রহস্যে সৌন্দর্য্যে আমরা মসগুল্—

There's music in the old bones yet

(F. R. Higgins)

একান্ত রিক্ততাই হল চরম দারুণ সত্য—গরীব দুঃখী দুঃস্থ সর্ব্বহারা, এরাই ত মানুষের মানুষ আসল মানুষ। এলিয়ট যে কবিত্বের হাওয়া এর মধ্যেও এনে দিতে পারেন নি, তা বোধ হয় বলা চলে না—তিনি যখন বলছেন :

He knew the anguish of the marrow
The ague of the skeleton
No coutact possible to flesh
Allayed the fever of the bone.

সত্যই কথাগুলি আমাদের অন্তর্নিহিত মানব-চিত্তকে কেবল নয়, কবি-চিত্তকেও গিয়ে প্রায় স্পর্শ করে। Cecil Day Lewis-এর কথাগুলি আরও মর্ম্মস্পর্শী—

Care on thy maiden brow shall put
A wreath of wrinkles, and thy foot
Be shod with pain; not silken dress
But toil shall tire thy loveliness.
Hunger shall make thy modest zone
And cheat fond death of all but bone—

সে যা-হোক আজ এক নূতন শ্রেণীর মানুষ, নূতন পরিস্থিতি—একটা নূতন সামাজিক আয়তনই কবি ও কাব্যের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আজ জগৎকে মানুষকে আমরা চিনতে পরখ করতে চেয়েছি একটি বিশেষ দিক দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে—অর্থের, অর্থাৎ, টাকা-পয়সার ওজনে। তাই আমরা বলছি সমাজ ছিল এক সময় রাজতন্ত্র—রাজাই ছিলেন তখন একমাত্র মানুষ; কবি তখন মানুষকে আঁকতে গেলে, মানুষের কথা বলতে গেলে

নিয়ে আসতেন রাজরাজড়া। কবির জগৎ তখন আবদ্ধ রাজার হাবেলির গণ্ডিতে। এর পর এল আভিজাত্যের অর্থাৎ 'বড়মানুষের' যুগ। কবিরা তখন দেখাতে লাগলেন যেন বড়লোকেরাই লড়াই করতে জানে, প্রেম করতে জানে, ট্রাজেডি একমাত্র তাদেরই জীবনে ঘটে (কমেডি হয়ত ইতর লোকদের ভাগ্যে - স্মরণ করুন 'লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং')। তারপর এল দারুণ ফরাসী বিপ্লব। রাজা-গজা বড়লোক সব উড়ে গেল—তখন সমাজে উঠে দাঁড়াল মধ্যবিত্ত বা ভদ্রসম্প্রদায় —এবং তাঁরাই এ যাবৎ জগৎকে এবং কবিচিত্তকে ভোগ-দখল করে এসেছেন। আর বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে এই শ্রেণীও তলিয়ে গেছে ও যাচ্ছে- এখন উঠে দাঁড়াচ্ছে ও দাঁড়াবে সমাজের চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। কবির কাব্য প্রকাশ করবে এই নূতন বর্ণের ধম্মকম্ম—তাদের আচার-বিচার, আহার-বিহার, তাদের আকার-প্রকার, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা বিফলতা।

রামকৃষ্ণ যে বলতেন 'লোক না পোক'—সে-চেতনা থেকে আমরা বহু দূরে সরে গিয়েছি। লোক-ভাষা, লোক-সাহিত্য, লোকশিল্প এখন কেবল ঔৎসুক্যের বিষয় নয়, তা হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধার সম্ভ্রমের পূজার পাত্র — এবং যে-মানবজাতি যত আদিম অসভ্য বন্য তারা যেন ততখানি কুলীন হয়ে উঠেছে, তাদের গানের তান, চিত্রের টান, ভাষার ছাঁদ কবিদের অনুকরণীয় হয়ে দাড়িয়েছে। আধুনিক কাব্যে পোকারও একটা স্থান ও মর্য্যাদা হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন যুগে কাব্যে বড় জোর শুনেছি 'canker in the rose'-এর কথা। কিন্তু আধুনিক পোকা-মাকড় কৃমি-কীট একটা জগৎ একটা চেতনা ব্যক্ত করে পরিস্ফুট করে ধরেছে—একজন ত মুগ্ধ নেত্রে বলছেন The long slow scolopendra…

আধুনিকের দৃষ্টি আর আকাশে বাতাসে আলোয় বিচরণ করে না— তার নজর ভূতলে পাতালে। মানুষের উত্তমাঙ্গ—তার জ্ঞান, তার আস্তিক্যবুদ্ধি, তার হৃদয়বত্তা—আমাদের কাছে বাহ্যশোভা পয়োমুখমাত্র

—আসল বস্তু তা রয়েছে নিচের তলায় ক্লেদ আর বিষ। তপস্বীর তপস্যায় সাধুর সাধুত্বে কবির কবিত্বেও আর মানুষের পরিচয় নয়—সকল মানুষের স্বরূপ রয়েছে তার Libido তার Oedipus complex-এর মধ্যে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক কোষ্ঠীকারদের হাতে কোন মানুষই আর দেবগণ নয়, নরগণও নয়, সবাই হয়ে উঠেছে রাক্ষসগণ—পিশাচ ও পশুগণ। উপরের আলো নিভে গিয়েছে, নিচের অন্ধকার উস্কে বসে আছি—চেষ্টা করছি নিচের অন্ধকারের দূরবীণ দিয়ে উপরের কিছু দেখা যায় কিনা আর কি ভাবে দেখা যায়।

মানুষের চেতনায় আজ এই যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে এর যে অর্থ নাই তা নয়। এটি রোগ হয়ত নয়—মানুষের চেতনায় একটা বিশেষ আকুতি-আস্পৃহার বাহ্যরূপ মাত্র। কি গোপন বার্তা, কি আবেগ কুণ্ডলিত এই পাতালবাসী চেতনায়, কি সার্থকতা চায় সে? সৃষ্টিতে নির্জলা মন্দ কিছু নাই—শয়তানও ততখানি কালো নয় যতখানি কালো করে তাকে আঁকা হয়—শয়তান ত আর এক জন্মে ছিল এঞ্জেল, তার নাম Lucifer, Son of Morning. আধুনিকদের চেতনায় এই যে নরকের বাসা তাতেও নিহিত কোন আলোর রেখা?

আধুনিক আদর্শবাদের কথা তা হ'লে বলতে হয়—আধুনিকও আদর্শবাদী তার নিজস্ব পথে ও ধরণে। আধুনিক চেতনার সমগ্র রহস্য এক কথায় বলা যেতে পারে অচেতনার চেতনা-লিপ্সা—অবচেতনার নিশ্চেতনার জাগরণ—পৃথিবীর মাটির জড়ের মধ্যে অন্তর্গূঢ় প্রাণের সংবেদনার সংজ্ঞানের স্পন্দন। আমরা বুঝে এসেছি মন কি চায়, তার আশা আকাঙ্ক্ষা কি—মানুষের হৃদপুরুষ কি চায়, কি তার আশা আকাঙ্ক্ষা তাও বেশ পরিস্ফুট—মানুষের প্রাণময় সত্তা কি চায়, কি তার আশা আকাঙ্ক্ষা তাও অপরিচিত নয়। কিন্তু শরীর কি চায়, জড়ের আশা আকাঙ্ক্ষা কি? বৃক্ষ যে মাটি ফুঁড়ে উর্দ্ধে উঠে চলেছে শাখা প্রশাখা পত্রাবলি প্রসারিত করে,

এই অজ্ঞান মূক বধির বস্তুর মধ্যে কোন চেতনা প্রস্ফুরিত ? শুনুন scolopendra-র কবি বলছেন—

> Is it towards sorrow or towards joy you lift
> The sharpness of your trembling spears ?
> Or do you seek, through the gray tears
> That blur the sky in the heart of the triumphing blue,
> A deeper, calmer lift ?—
>
> (Song of Poplars—Aldous Huxley)

ফলতঃ আধুনিকের এই আকৃতির মধ্যে একটা আদর্শবাদ একটা সংস্কারৈষণা যে ফুটে উঠেছে, তাও আধুনিকের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীনতর কবিদের মধ্যে একটা আদর্শবাদ অর্থাৎ সংস্কারৈষণা যে কবিত্বের অঙ্গ ছিল তা মনে হয় না। তাঁদের পদ্ধতি—কলাকৌশলের মূল সূত্র ছিল holding up the mirror to Nature—অর্থাৎ কবির কর্ম্ম হল যা আছে, যা সত্যং তাকেই সুষ্ঠুরূপে প্রতিফলিত করে ধরা ; এই প্রতিফলন ক্রিয়ায় বড় জোর প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা, নিহিতার্থের ব্যঞ্জনা (revelatory and interpretative power) ; কিন্তু দৃশ্যের দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষা, যা দেখছি তা যেমনটি দেখছি না হয়ে আর একটি যদি হত এই কামনা ও আস্পৃহা তাদের ছিল না। আধুনিক কবি ঠিক এই জিনিষই চান—আধুনিক কবির কাব্যসূত্র Matthew Arnold দিয়ে গিয়েছেন—কাব্য হল criticism of life, এই তার পরিচয়। আধুনিক কবি-শক্তি তাই গতিমান বেগময় (dynamic), প্রাচীনতম কবিশক্তি সে হিসাবে স্থিতিমুখী (static)। সচল ছবি (সিনেমাটোগ্রাফ) দেয় আধুনিক কবিধর্ম্মের প্রকৃতি—প্রাচীনের কবি-প্রকৃতি প্রকটিত নিশ্চল চিত্রে—ফ্রেমের মধ্যে আঁটা বাঁধা, প্রাচীর গাত্রে স্থিরভাবে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত, পর্ব্বতের স্থানুত্বের উপর উৎকীর্ণ।

প্রাচীনতন আর ইদানীন্তন কবিদৃষ্টির একটা বিশিষ্ট পার্থক্যের কথা আমি বলছিলাম। প্রাচীনতন বলতে বুঝব যাকে সচরাচর বলা হয় "ক্লাসিকাল"। এ দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল দ্রষ্টা-ভাব, সাক্ষীভাব—বস্তুকে বিষয়কে সত্যকে দেখে যাওয়া, তার প্রতিমূর্ত্তি রচনা করা। যা আছে যা দেখছি তারই রয়েছে এক অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য—সেই সৌন্দর্য্যকে ধরে দেখানই কবির শিল্পীর সমস্ত কৃতিত্ব। এ শিল্পের—"ক্লাসিকাল" রীতির—মূল লক্ষণ তাই প্রশান্ত স্থিতি। এখানে প্রকাশ পেয়েছে শিল্পী-চেতনার অবিকল স্থৈর্য্য, সন্তোষ, প্রসন্নতা। তবে এর অর্থ নয় সে-যুগে কারুণ্য ছিল না, বিষাদ ছিল না—সবই ছিল মিলনান্তক, বিয়োগান্ত কাহিনী, ট্রাজেডি ছিল না। তা নয়। জীবনের ট্রাজেডিকেও গ্রহণ করা হত স্থির সত্য বলে, তাকে দেখান হত একটা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, এঁকে তোলা হত অবিকম্প তুলিকায়। অন্য কথায়, প্রাচীন কবিদের এই কারণেই বলা হত আদর্শপন্থী ভাবুক, idealist, আর তার বিরোধী বলেই আধুনিকদের নাম দেওয়া হয় realist, বস্তুতন্ত্রী স্থূলাশ্রয়ী। অর্থাৎ প্রাচীনেরা স্থূল জগতের বাস্তবের কথা বললেও, তার মধ্যে এমন একটা দৃষ্টি, এমন একটা ব্যঞ্জনা দিয়ে ভরে দিতেন, এমন একটা আবহাওয়ায় তুলে ধরতেন যে মোটের উপর তাকে প্রেয়ের শ্রেয়ের ভগবানেরই রাজ্য বলে মনে হত—মোটের উপর এই অনিত্য এই অসুখী পৃথিবীতেও ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়—পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, কবির লেখনীও এই ব্রতেই নিযুক্ত ছিল। অধিকন্তু তাঁরা সৃষ্টি করে গিয়েছেন, উদ্ঘাটিত করে গিয়েছেন এমন লোক এমন ভূমি এমন চেতনার আয়তন যেখানে জগৎ-সংস্কারের প্রশ্নই ওঠে নাই—মাদোনা (Madonna)-র ছবি সব—জগৎ যথা সম্ভব "সংস্কৃত" হয়েই ফুটে উঠেছে। আধুনিকেরা এই ধারাকে idealism নাম না দিয়ে, তিরস্কার করে এর নাম রেখেছেন escapism—পলায়ন বৃত্তি। ফলতঃ কাব্য ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে একটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যত আমরা

আধুনিক যুগের দিকে অগ্রসর হয়েছি, তত যেন আমাদের সংস্কার-স্পৃহা বেড়ে উঠেছে, কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে শান্তির স্থৈর্য্যের পরিবর্ত্তে একটা চাঞ্চল্য অসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছে। কবি আর কেবল কবি নন, তাকে হয়ে উঠতে হবে নবি—ইদানীন্তন কালের বহুজনসম্মিত art for art's sake মন্ত্র ও তন্ত্র সত্ত্বেও।

প্রাচীন কবি-চিত্ত ছিল স্থৈর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, জগৎকেও তাঁরা দেখতেন একটা স্থিরত্বের প্রকাশ হিসাবে। জগতকে পরিবর্ত্তিত করবার প্রেরণা সহজে আসে না, যখন জগৎ হ'ল দুর্ব্বার কর্ম্মচক্র, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি। জগতে যা কিছু ঘটছে তা হল—বৈদিক ঋষির ভাষায়—ঋতের অকাট্য ছন্দ, দেব বরুণের "অদব্ধ ব্রত" (অদম্য কর্ম্মধারা)। গ্রীক কবিও পূজা করেছেন Zeus-এর অলিখিত বিধানকে, Nomoi-কে। মধ্য যুগের মনীষীরা পর্য্যন্ত বলে গিয়েছেন আমরা যেখানে আছি তা best of best possible worlds—এর চেয়ে ভাল বাসস্থান আর হয় না। যা আছে, যা ঘটে তা সব মঙ্গলের জন্যই—জগতের বাহ্যপারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন কোন প্রয়োজন হয় না—প্রয়োজন কেবল আমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টির কিছু পরিবর্ত্তন, দৃষ্টির অজ্ঞান-যবনিকা সরিয়ে দিতে পারলেই দেখব "সুন্দর ভুবনে সকলি সুন্দর"। সেখানে ফাঁক নাই, ত্রুটি নাই, খুঁত নাই।

অবশ্য প্রাচীনদের মধ্যে সংস্কার-স্পৃহা আদৌ ছিল না বললে ভুল হবে। জগৎ দুঃখকষ্টময়, মানুষের জীবন অনর্থে পরিপূর্ণ, সুতরাং এর একটা প্রতিবিধান যে প্রয়োজন সে সম্বন্ধে চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ বরাবরই নিশ্চয় করে এসেছে। কিন্তু প্রথম কথা এই সংস্কারকেরা রোগের উপশম ছাড়া বেশি কিছু করবার আশা রাখতেন কি-না সন্দেহ। আর যে ভিষক চেয়েছেন রোগের আমূল প্রতিকার বা উচ্ছেদ তিনি ফলতঃ যে পরামর্শ দিয়েছেন তার অর্থ রোগীর নিজেরই উচ্ছেদ—বুদ্ধের নির্ব্বাণ, শঙ্করের মায়া। দ্বিতীয় কথা, কবি ওদিক দিয়ে যান নি—তিনি বিশ্বকে পরিবর্ত্তন করেছেন বটে, কিন্তু নিজের চোখে অঞ্জন মাখিয়ে, বিশ্বকে তিনি বলতে

পেরেছেন—"আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা"। গদ্যে পদ্যে সংস্কারের প্রচার করা হয়েছে সত্য, কিন্তু তা কাব্য নয়, কবিত্বের পর্য্যায়ে তার স্থান নয়।

স্থির-দৃষ্টির প্রশান্ত প্রসন্ন মুকুরে, উদার চেতনার নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যে প্রথম বিক্ষোভ, অসচ্ছতা আনলেন যাঁরা তাঁদের নাম "রোমান্টিক"। অর্থাৎ জগৎটি যেমন আছে তেমন স্বীকার করা, যা দেখছি নির্ব্বিচারে নির্ব্বিকারে তাই গ্রহণ করা সমর্থন করা এঁদের পক্ষে আর সম্ভব হল না। এঁরা চাইলেন বাহিরের বস্তুর পরিবর্ত্তন, বিষয়ীর শুধু নয় বিষয়েরই বাস্তব রূপান্তর, যা আছে তা নয়, তাকে ভেঙেচূরে সরিয়ে তার জায়গায় বসাতে হবে যা হওয়া উচিত তাকে। এঁরা হলেন বিদ্রোহী কবি—গালাগালি দিয়ে এঁদের কাউকে অনেক সময় বলা হয় Satanic poets; ইংরাজী কাব্যে শেলী, ফরাসীতে হিউগো, জর্ম্মনে গ্যেটে হলেন এই নবভাবের এক এক দিক্‌পাল।

তাই বলছিলাম প্রাচীনতন কবিরা সত্যের সুন্দরের দেখেছেন দেখিয়েছেন স্থিতির মূর্ত্তি—তার গতিমান মূর্ত্তি ইদানীন্তন কবির আবিষ্কার। যা আছে তাই সুন্দর, দুঃখকষ্টের প্রতিরূপ বা আলেখ্য যদি দেখাই, তার উদ্দেশ্য এ ভাবে মানুষের হৃদয় কারুণ্যে ভরে দিয়ে শুদ্ধ করে তোলা, এই ছিল ট্রাজিক কবির সার্থকতা, প্রাচীন আলঙ্কারিকের মতে। ওমর খৈয়ম বলেছেন বটে—

Ah, Love! could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry scheme of things entire,
Would not we shatter it to bits—and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!

কিন্তু কবির এ হল দিবাস্বপ্ন, আকাশ কুসুম রচনা, তিনি দুঃখের নেশাতে—এক রকম আনন্দেই—মশগুল, জগতকে ওরকম ভাবে পরিবর্ত্তন করে ফেলবার মতলব সত্যসত্যই তাঁর নেই। কবি এখানে দ্রষ্টা বা সাক্ষীমাত্রই

হয়ে রয়েছেন—প্রায় অঙ্গহীন জগন্নাথের মত—নবি হয়ে ওঠেন নি, তাঁর কর্ম্মেন্দ্রিয় সব এখনও ফুটে বের হয়নি।

কবি নবি হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে রীতিমত মতলব করে বলেছি "রোমান্টিক"-দের দিয়ে—শেলি থেকে সুরু করে এলিয়ট অডেন অবধি নবিত্বের ধারা কি রকমে কবিত্বের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছে, কাব্যের দিয়েছে নবতর প্রকাশ, তার ইতিহাস কৌতুহলপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ। প্রথমে পূর্ব্বরাগ—দিব্যশ্রুতি—unheard melodies শ্রবণ—আদর্শ কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। তারপর ক্রমে দর্শনের ভিতর দিয়ে স্পর্শনের ভিতর দিয়ে অন্তর আকৃতি স্থূল-লিপ্সা ও বাস্তব-সম্ভোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। কবি-চিত্তের যে প্রশান্তি, যে স্বর্গীয় বিশুদ্ধি, তাতে ছেদ টেনে দিলে একটা দ্বৈতজ্ঞান,—নব-আকাঙ্ক্ষা-জাত অভাব-বোধ। কবির ভিতরে জেগেছে একটা দিব্য চেতনা, তার আলোতে তিনি দেখছেন এক দিব্য সত্য ও সৌন্দর্য্য, তাঁর অনুভবে দৃষ্টিতে প্রতিফলিত প্রতিরঞ্জিত এক সুন্দর জগৎ সুন্দর মানবজাতি কিন্তু বাস্তবে এ চিত্র ব্যাহত এক বিপরীত বিরোধী সত্যের সংঘাতে। কবি-চিত্তের সমস্ত বেদনা আর্ত্তি দাক্ষিণ্য ফুটে উঠল এই বৈপরীত্যের রূঢ় সংযোগে. কবিচিত্তের সমস্ত ব্রত ও লক্ষ্যই ক্রমে হয়ে উঠল এই অসামঞ্জস্য দূর করে, স্বপ্নকে স্থূলবাস্তবে ফলিয়ে ধরা। কবি কেবল সুন্দরের গায়ক হয়ে থাকবেন না, তাঁকে হতে হবে সত্যের শাস্তা। বৈদিক ঋষিরা বলতেন কবি বা ঋষি হলেন সত্যের, সত্যের ছন্দ বা গতির—ঋতের—রক্ষক "গোপ্তা"। আধুনিক কবি হয়ে উঠেছেন কেবল রক্ষক নয়, রক্ষী, শাস্ত্রী, বীরকর্ম্মী ও যোদ্ধা। তবে তাঁকে প্রশ্ন তুলতে হয়েছে সত্য কি সুন্দর কি? ইন্দ্রিয়ের বাহিরে, না ইন্দ্রিয়ের মধ্যে, না উভয়কে নিয়ে। পূর্ব্বতন কবিদের এ বালাই ছিল না, তাঁরা গেয়ে গেছেন সহজ অনুভব উপলব্ধিকে আপনহারা আনন্দের আবেশে। কিন্তু আধুনিকেরা জানতে চায় তারা কি গায়, তারা গাইতে চায় সজ্ঞানে।

আধুনিক কবিত্বের মন্ত্রদাতা শেলি কবিত্বের ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, কাব্য কি করে, না—

"redeems from decay the visitation of divinity in man."

মানুষের মধ্যে যে ভগবানের প্রকাশ তাকে ক্ষয় হতে না দেওয়া, তাকে জীইয়ে রাখা এই হল কবির কাজ। কবিত্বের চিরন্তন স্বরূপ সম্বন্ধে, আধুনিক কাব্য-সৃষ্টির ধারা যে লক্ষ্যের দিকে চলেছে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে এ উক্তি সত্যই মন্ত্রবৎ প্রোজ্জ্বল ও শক্তিময়। কবি যে কেবল সুন্দরের পূজারী নন, লৌকিক সৌন্দর্য্য যত সুন্দরই হোক, আবার একটা লোকাচার-সম্মিত নৈতিক আদর্শই যে কবির লক্ষিত সত্য, তাও নয়—সত্যকার সৌন্দর্য্য একটা দিব্য ভাগবত সত্য আর দিব্য ভাগবত সৌন্দর্য্যই পরম সত্য—এ বাণী এনেছেন শেলি, এবং তাকে কবির মর্ম্মবাণী করে ধরেছেন—তাই বলছেন:

And, by the incantation of this verse,
Scatter, as from an unextinguished hearth
Ashes and sparks, my words among mankind!
Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy! O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?

বায়রণও হলেন সেই একই মনোভাবেরই বিদ্রোহী যোদ্ধ মূর্ত্তি—পৃথিবীর উপরে মানুষের মধ্যে (হয়ত নিজের মধ্যেও) স্থূলদৃষ্টির ইহসর্ব্বস্বতার লোকায়ত-বৃত্তির প্রাবল্য দেখেই যেন ক্রোধে ক্ষোভে গর্জ্জে উঠেছেন:

Jehova's vessel hold
The godless heathen's wine...

কবিচিত্ত বাহিরের মতবাদ হিসাবে নয়, অন্তরের ধর্ম্মে ও ছন্দে—কতখানি আস্তিক অধ্যাত্মার, আশার বার্ত্তাবহ হয়ে উঠেছে তার আরও স্পষ্টতর দৃঢ়তর পৈঠা ব্রাউনিং। যখন তিনি বলছেন:

Grow old along with me !
The best is yet to be,
The last of life, for which the first was made :
Our times are in His hand
Who saith "A whole I planned..."

তখন শিল্পী—বাক্যে অর্থে ভঙ্গীতে—প্রায় পুরোপুরি নবির, দিব্য ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার আসন গ্রহণ করেছেন। ভিক্টোরিয়ার মধ্যাহ্ন যুগে বাহ্য শালীনতার ভব্যতার সন্তোষের অন্তরালে, চিন্তায় ভাবে কর্মে ব্যবহারে একটা স্থূল সৌষীম্যের পশ্চাতে, যে কারুণ্য যে বিক্ষোভ যে তৃষ্ণা চলচঞ্চল হয়ে উঠেছিল তার মূর্তি ম্যাথু আর্ণল্ড—কি গাঢ় অন্তর্দাহে তিনি বলেছেন :

But now I only hear
Its melancholy, long, withdrawing roar,
Retreating to the breath
Of the night-wind down the vast edges drear
And naked shingles of the world.

শেষে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি, সব ব্যথা নিরাশা ঝেড়ে ফেলে মুখর হয়ে বলে উঠলেন :

Strengthen the wavering line,
Stablish, continue our march
On, to the bound of the waste
On, to the City of God.

যে কারুণ্যের কথা বলেছি তা সান্দ্র একান্ত হয়ে, প্রায় নৈরাশ্যেই পরিণত হয়েছে হার্ডির মধ্যে—হার্ডির নির্জলা অসৌখ্য দুর্মনস্ক সর্বজনবিদিত। আমরা Dean Inge-এর কথা জানি, যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে the gloomy

Dean—হার্ডিকেও আরো ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা যেতে পারে the gloomy Hardy সত্যই শুনি যখন :

That engulphing, ghast, sinister place,—
Whither headlong they plunged, to the bottomless
regions
Of myriads forgot

কিংবা

And the whirr of their seafaring thinned
And surceased on the sky, and but left in the gloaming
Sea mutterings and me—
(The Souls of the Slain)

তখন কি একটা অকথিত সর্ব্বহারা আতঙ্কে শিউরে উঠি না ? কিন্তু কবির এই অসৌখ্যের হেতু কি, কোন অভাব তাঁর ভিতরটা খেয়ে চলেছে ? কি পেলে তাঁর মুখে হাসি ফোটে। শুনুন তবে সত্যই তাঁর হাসি ফুটেছে প্রায় এই আশার কল্পনায় :

When I came back from Lyonnesse
With magic in my eyes
All marked with mute surmise
My radiance rare and fathomless,
When I came back from Lyonnesse.
With magic in my eyes !

কবিচিত্তের এই নিগূঢ় নিবিড় আকাঙ্ক্ষা আরো বুদ্ধিগোচর করে ব্যক্ত করেছেন রবার্ট ব্রিজেস :

For beauty being the best of all we know
Sums up the unsearchable and secret aims

Of nature, and on joys whose earthly names
Were never told can form sense bestow—

অথবা এই কথায়ঃ

All earthly beauty hath one cause and proof,
To lead the pilgrim soul to beauty above..
(Sonnets)

সেই একই অনুভব, একই সত্য ও তথ্য Hopkins ব্যক্ত করেছেন তাঁর এই উদ্দাম উদ্বেল কলকল ছলছল পাগলাঝোরা ভাষায় ও ভঙ্গীতেঃ

There is one, yes I have one....
Only not within seeing of the sun,
Not within the singeing of the strong sun..
or treacherous the fainting of the earth's air,
Somewhere elsewhere....
Where whatever's prized and passes of us,
everything that's fresh and fast flying of us..
Never fleets more, fastened with the tenderest truth
To its own best being and its loveliness of youth :
it is an everlastingness of. O it is an all youth.
(St. Winefred's Well)

এ পর্ব্ব এই পর্য্যন্ত। এখন নূতন আর একটা অধ্যায় সুরু, নূতন একটা বাঁক ঘুরতে হয়েছে কবিচিত্তের—যেখান থেকে বলা যেতে পারে অতি-আধুনিকের যাত্রা। Eliot-কে গ্রহণ করা যেতে পারে এই নূতন যুগের পুরোহিতরূপে। এলিয়টের মধ্যে—এবং অতি-আধুনিকের চেতনায় —দু'টি বিরোধী (আপাতদৃষ্টিতে) ভাব, দৃষ্টি ও প্রেরণা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমতীর্থ হয়েছে। এক ধারায় বলছে সব ঝুটা, দুনিয়াদারি দিগদারি—

vanity of vanities, all is vanity; আর এক তার গাইছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ

> মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে…
> ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
> বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
> মানবের সুখে দুঃখে গাথিয়া সঙ্গীত
> যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়—

এ অবশ্য এলিয়টের ভঙ্গী নয়, কান্ত-কোমল রোমান্টিক ভাব তাঁর মধ্যে আদৌ নাই—সে কথা পরে বলছি। কিন্তু পৃথিবীর মাটির মানুষের উপর টান তেমনি দৃঢ় গাঢ় দুর্ব্বার। এক দিকে কবি অভিভূত ব্যথিত প্রায় হতাশই হয়ে উঠেছেন সৃষ্টির পদার্থের মানুষের ভঙ্গুরতা শূন্যতা দেখে; বাহিরে জিনিষ সব নশ্বর ক্ষণিক; অন্তরেও তারা তেমনি রিক্ত, অন্তঃসারশূন্য (Hollow Man)। অথচ সেই সঙ্গেই মর্ত্ত্যের যাবতীয় কণিকা ক্ষণিকা তাদের শত তুচ্ছতা নিয়ে বিছিয়েছে এই মায়া। প্রথম যুগের এলিয়ট এই দু-ধারার টানায় ও পোড়েনে কিছু তিক্ত ও ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন—এদের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু সে-সামঞ্জস্য তিনি পেয়েছেন (বিশেষ ভাবে তাঁর নূতন Four Quartets নামক পুস্তিকায়), পেয়েছেন একটা উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার—কতকটা খৃষ্টীয়, কতকটা ঔপনিষদিক—অনুভবের মধ্যে। অর্থাৎ যখন তিনি সীমার মাঝে অসীমের স্ফুরণ দেখতে সুরু করলেন, দেহের মধ্যে দেহের ও-পারের চিহ্ন সব আবিষ্কার করলেন। জগৎ ততক্ষণ মায়া মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর যতক্ষণ তার ভিতর দিয়ে তাকে উজিয়ে অতিক্রম করে মানুষের অন্তরাত্মা চলে ভগবানের দিকে, দিব্য-চেতনার সত্য ও সৌন্দর্য্যের দিকে। কিন্তু সেই জ্যোতির্মণ্ডলে পৌঁছে গেলে পর, এদিকে ঐহিকের উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায় বোঝা যায় এখানকার যাবতীয় ক্ষুদ্র তুচ্ছ অবান্তর আবর্জ্জনা—এমন কি কুৎসিত কলুষ পর্য্যন্ত

একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যের বা অর্থের আভায় ব্যঞ্জনায় ভরে ওঠে—তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। আগে মানুষকে আত্মহত্যা করতে হবে তবে সে আমাকে পাবে, তাকে সব রূপ রসাদি বর্জ্জন করে ঊষর মরুতে প্রবেশ করতে হবে, এই পার্থিব স্তিমিত আলো নিবিয়ে দিয়ে একেবারে অন্ধকারে ডুবে যেতে হবে তবে সে উত্তীর্ণ হবে পরমজ্যোতির মধ্যে। আর তখন পার্থিব রূপ রস আলো নব সার্থকতা নিয়ে এসে দেখা দেবে। কাল মানুষের গতিকে ব্যাহত করে, এই কালের পৃষ্ঠ আরোহণ করেই তাকে ছুটতে হবে কালাতীতের দিকে—মহাকালরূপী আনন্ত্যই আবার মুহূর্ত্তে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে দিব্য চেতনায়। Eliot খৃষ্টের পথ অনুসরণ করে, তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আবার ঔপনিষদিক নব-ব্রাহ্মণ (Neo-Brahmin), শ্রীকৃষ্ণ-পূজারী পর্য্যন্ত হয়ে উঠেছেন :

So Krishna, as when he admonished Arjuna
On the field of battle.
Not fare well
But fare forward, voyagers.

(The Dry Salvages)

অর্থাৎ নির্ব্বাণ নয়, লয় নয়—ব্রাহ্মীস্থিতি নিয়ে চলতে হবে জীবনে এবং জীবনে জীবনে।

এলিয়টে যে পরিণতি পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে, তাঁর পরবর্ত্তী কবি-কুলে তা দেখা যায় নি, তবে যে ব্যথা যে আকূতি যে আস্পৃহা সে পরিণতি নিয়ে এসেছে তা নানাভাবে নানা রাগে-বিরাগে ছন্দিত মুখরিত হয়ে উঠেছে আর-সকলের মধ্যে। সে-পরিণতির অনুরূপ কিছু তবু পাই মাঝে মাঝে। এই ত সেদিন এক নবীন তরুণ কবি লিখেছেন :

All who would save their life must find the desert
..until you have crossed the desert and faced the fire..

(Sidney Keyes—The Wilderness)

এত প্রায় এলিয়টের কথা—এলিয়টের ধর্ম্মতত্ত্ব সাধনতত্ত্ব হল এই :

To arrive where you are, to get from where you are not.

অর্থাৎ যেখানে তোমার সত্যকার স্থিতি সেখানে যাওয়া, আর যেখানে তোমার সত্যকার স্থিতি নয়—এই মায়াময় জগতে—সেখান থেকে মুক্তিলাভ।

You must go by a way wherein there is no ecstasy,
(বাইবেলের Blessed are they that mourn)
In order to arrive at what you do not know
You must go by a way which is the way of ignorance
(উপনিষদের "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"—)
In order to possess what you do not possess
You must go by the way of dispossession.
(বাইবেলের To him that hath not shall be given)
In order to arrive at what you are not
You must go through the way in which you are not.
And what you do not know is the only thing you know
And what you own is what you do not own
And where you are is where you are not.
(East Coaker)

এই কথাই—মানুষের জীবন সাধনার নিভৃত রহস্য—আরও জলন্ত প্রদীপ্ত ভাষায়, এবার বুদ্ধি বিচারের নয়, উপলব্ধির জীবন্ত রাগে বলছেন :

The dove descending breaks the air
With flame of incandescent terror
Of which the tongues declare
The one discharge from sin and error.
The only hope, or else despair

Lies in the choice of pyre or pyre—
To be redeemed from fire by fire.
(Little Gidding)

আমি এলিয়টের কথা একটু বেশি করে বলছি এই জন্যে যে তিনি আধুনিকের সমগ্র সমস্যাটি যেমন পুরোপুরি ধরে দেখিয়েছেন, তেমনি তার সুনিপুণ মীমাংসার রাস্তাও একটা আবিষ্কার করে দিয়েছেন। আধুনিক চেতনার বহির্মুখতা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা তিনি যেমন তাঁর সকরুণ তুলিকায় এঁকে ধরেছেন, তেমনি বলেছি এ সকলকে একটা আশার আলোর মধ্যে, একটা অভিনব সার্থকতার মধ্যে পরিসমাপ্তি দিয়েছেন।

আধুনিকের সমস্যাটি ঠিক কি? সৃষ্টি-ছন্দ কোথায় কেটে যায়? অন্তরে তাঁদের কোথায় বিঁধছে কাঁটাটি? সমস্যা, এক কথায়, কণিকার ক্ষণিকার তুচ্ছের রহস্য। নশ্বরের খণ্ডিতের, ভস্মান্তের রিক্ততার, দুঃস্থতার, একান্ত স্থূলের জড়ের হাড়মাসের, লোহালক্কড়ের, দৈনন্দিন উদ্ব্যস্ততার কর্ম্মব্যাপৃতির সঙ্গীত, এ সব বহুল বাহুল্য, আধুনিক প্রশ্ন তুলেছে, কি সত্য সত্যই তুচ্ছ নিরর্থক? তবে তারা আমাদের এতখানি পেয়ে বসেছে কেন, কেন আমাদের অঙ্গেরই অঙ্গ হয়ে উঠেছে? একদল—বিদ্রোহী যাঁরা, দারুণ অভিমানী যাঁরা—তাঁরা বলে উঠেছেন, তাই ভাল, যত তুচ্ছ হয় ততই সুন্দর, যত শ্রীহীন জুগুপ্সাপ্রদ হয়, ততই আমাদের তা শ্রেয়, প্রেয় ও পূজ্য—

—chimneys like lank blank fingers
Or figures frightening and mad : the squat buildings
With their strange air behind trees, like women's faces
Shattered by grief—
(Stephen Spender)

কিন্তু আমি বলছি এ হল শত্রুভাবে সাধনা, রতি বৈপরীত্য—কারণ এঁরা চান ধূলিমুঠিকে স্বর্ণমুঠিতে পরিণত করতে, পতিত ঊষর জমিতে সোনা

ফলাতে, সেই দিব্য রাসায়নিক গুপ্তবিদ্যার সাধক তাঁরা—তাঁদের চোখে সুন্দর লেগেছে :

Slow toads, and cyclamen leaves
Stickily glistening with eternal shadow
Keeping to earth.
Cyclamen leaves
Toad-filmy, earth-iridescent
Beautiful
Frost-filigreed
Spumed with mud
Snail-nacreous
Low down

(D. H. Lawrence—Sicilian Cyclamens)

কিন্তু কেন, এ-দৃষ্টি খুলে দিয়েছে কার স্পর্শ কি প্রেরণা ?—

When they felt their forehead bare, naked to heaven,
their eyes revealed :
When they felt the light of heaven brandished like a
knife at their defenceless eyes,
And the sea like a blade at their face—

(Ditto)

এই যে সব রসাতলের অন্ধকারের কর্দমের জীব

From gloom's last dregs these long-strung creatures
crept,
And vanished out of dawn down hidden holes

(Wilfred Owen—The Show)

কোথায় এদের গতি, কি চায় এরা—অন্ধকারের সার্থকতা কি ? পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম আলোকেরই মধ্যে গাঢ় গাঢ়তর গাঢ়তম অন্ধকারের পরিসমাপ্তি রূপান্তর :

Darkness, I know, attendeth bright,
And light comes not but shadow comes···
Ah no, it shall not be ! The joyous light
Shall hide me from the hunger of fear tonight ··
For wonderfully to live I now begin :
So that the darkness which accompanies
Our being here, is fasten'd up within
The power of light that holdeth me···
For henceforth, from tonight,
I am wholly gone into the bright
Safety of the beauty of love—

(Lascelles Abercrombie—Marriage Song)

আমাদের কবিরা অন্ধকারের আহ্বান—নিশির ডাক শুনেছেন, কিন্তু তার মধ্যে হাতছানি দিয়েছে সুদূরের আলো :

They sing
And in my darkened soul the great sun shines ,
My fancy blossoms with remembered spring,
And all my autumns ripen on the vines—

(Aldous Huxley—The Cicadas)

তাঁর প্রাণের আকূতি কবিকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, সময় সময় তাঁর সব গুলিয়ে যায়, পথ আর দেখেন না, গন্তব্যও অস্পষ্ট, সাধ্যেরও বুঝি বাহিরে :

There is my lost Albana,
And there is my nameless Pharphar···
And I say I will go there and die there :
But I do not go there······
And it is possible, may be,
That it's farther than Asia or Africa,
Or any voyager's harbour,
Farther, farther, beyond recall..
O even in memory ! (J. C. Squire—Rivers)

আমাদের কবিরা চান সত্যসত্যই সত্যকারের অন্ধকার—অন্ধকারের ভান নয়, অনুকরণ নয়—ফিকে আলো-আঁধার নয়, তাঁরা যেন চান সেই :

তমো আসীৎ তমসাগূঢ়ং···গহনং গভীরং সলিলমপ্রকেতং

যে অন্ধকার অন্ধকারে ঢাকা, যা হল গহন গভীর অচেতনার সাগর। কারণ, এই ত আদি প্রকৃতি-মাতা, এরই গর্ভে নিহিত পরম জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। আধুনিক কবিকুল খুঁজে খুঁজে যত তামস সৃষ্টির জীবকে রণাঙ্গনে কি রঙ্গ-মঞ্চে নামিয়েছেন—কারণ এদের দিয়েই ত স্বর্গ অধিকার করাতে হবে :

Urging their journey on
Till earthly hosts have won
To peaks lit by the farthest ray of thought's
unearthly sun
(Middleton Murry—Tolstoy)

আমরা এই "earthly hosts"-এর কাছে বাঁধা পড়ে আছি—পূর্ব্বতন সাধক বা কবিদের মত এই বাঁধন কেটে, ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতে চাই না স্বর্গে, আমরা চাই এদের সবকে নিয়ে সবান্ধবে সশরীরে স্বর্গের নিমন্ত্রণে যেতে। উপনিষদে আছে—"ইহৈব তৈর্জ্জিতং"—এলিয়ট

কথাটিকে আধুনিক দার্শনিক তত্ত্ববাদের খোলস পরিয়ে বলেছেন এই ভাবে —বর্ত্তমানের মধ্যে এসে মিলেছে অতীত ও ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকে কেবল বর্ত্তমান হিসাবে দেখাই হল অজ্ঞান মৃত্যু, তাকে দেখতে হবে অতীত ভবিষ্যতের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ; তাই মুহূর্ত্তের, এই ক্ষণের মধ্যে ঝলসিত সমস্ত আনন্ত্য। ক্ষণকে বেঁধে রাখলেও চলবে না, হারিয়ে ফেললেও চলবে না—হারিয়ে ফেললে যে অনন্ত পাওয়া যাবে তা হল নির্গুণ নিঃস্বাদ—রিক্ত abstract অনন্ত। কাল সম্বন্ধে যে কথা দেশ সম্বন্ধেও তাই। শুনুন এলিয়টের রহস্যময় তত্ত্ব :

There are other places
Which also are the world's end, some at the sea jaws
Or over a dark lake, in a desert or a city—
But this is the nearest, in place and time,
Now and in England—

এই একই সিদ্ধান্ত আরও সূত্রাকারে বলছেন :

Here, the intersection of the timeless moment
Is England and nowhere, Never and always.
(Little Gidding)

আমি এলিয়টের কথা বারে বারে বলছি এই জন্য যে তিনি আধুনিকের মনোভঙ্গী এক দিক দিয়ে চরম করে দেখিয়েছেন—সে মন চিন্তা-ভারাক্রান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সমস্যা-পূরণের সাধনায় আপ্রাণ চেষ্টায়। কবির এই ব্যাপৃতি, এই আন্তর কৃচ্ছ্রপ্রযত্ন তাঁর চিত্তকে স্থির প্রসন্ন হতে দেয় নাই —তাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেখি যতখানি রয়েছে গতির ছন্দের প্রবেগ, ততখানি তাতে ধরা দেয় নাই রূপের সৌষীম্য পরিপূর্ণতা। তাঁর চিত্ত ছুটে চলেছে, অথবা চক্রাকারে ভ্রাম্যমান, একটা দূরের অবলম্বনকে সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করে—সেখানে সে পৌঁছে নাই, তাতে গিয়ে শরবৎ তন্ময় হয়ে যেতে

পারে নাই—তাই সেখানে রণিত হয়েছে সাধকের পথিকের চির-চলার অসমাপ্ত রেশ, নাই সিদ্ধির নিটোল সমাহিতি। নূতন চেতনার অনুরূপ নূতন আকার কাব্যপুরুষ গড়ে তুলতে চেয়েছেন—কিন্তু এখনও তার পরীক্ষা চলছে, পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। নূতন চেতনার বাহন নূতন ভাষা আবিষ্কার করা যে কত কঠিন এলিয়ট তা নিজে বলেছেন এবং প্রমাণও করেছেন তাঁর নিজের রচনায়।

এই নূতন চেতনার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল সূক্ষ্মতা। পূর্ব্বতন কবিরা দিয়েছেন মোটা ভাবের মোটা প্রকাশ—তাই তাঁরা এতখানি সাফল্য লাভ করেছেন। মোটা ভাব অর্থ যে কেবল বহির্জীবনের স্থূল অভিজ্ঞতার কথা তা নয়, অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাব অভিজ্ঞতাও মোটা হতে পারে। Crashaw যখন বলেছেন মানুষের আদর্শ ও আস্পৃহা হল :

Heaven in Earth and God in Man

(Hymn of the Nativity)

কিংবা Wordsworth যখন বলেছেন :

Our birth is but a sleep and a forgetting
The soul that rises with us, our life's star
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar :
Not in entire forgetfullness,
And not in utter nakedness
But trailing clouds of glory do we come
From God who is our home—

এও আধ্যাত্মিক চেতনার একটা মোটা তারই। আধুনিকেরা চান সূক্ষ্মতর তন্ত্রীর মূচ্ছ্ না। জিনিষের আকার মাত্র যাতে দেয় না, কিন্তু দেয় তার প্রকারের সংবাদও কিছু—বাহিরের গতিকে কেবল ফুটিয়ে তোলে না,

কিন্তু প্রকাশ করে ভিতরের গুপ্ত কলকব্জার ছন্দ ও রহস্য। চেতনা যদি ঊর্দ্ধে উঠে চলে গেল—অসীমের অনন্তের মধ্যে—সে সহজ; পূর্ব্বতন সকল আধ্যাত্মিক সাধকের তাই লক্ষ্য, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন কবিরা এই ভাবেই তাঁদের অনুভব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা আজ ও-ভাবে উঠে যেতে চাই না—আমরা যেতে চাই জিনিষের যেন পিছনে, কোন রহস্য তাকে গড়ে চালায় প্রতি মূহূর্ত্তে। এই ধরুন না এলিয়টের ভঙ্গি :

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
Through the unknown, remembered gate
When the last of earth left to discover
Is that which was the beginning ;
At the source of the longest river
The voice of the hidden waterfall....
And all shall be well and
All manner of thing shall be well
When the tongues of flame are in-folded
Into the crowned knot of fire
And the fire and the rose are one.

(Little Gidding)

আধুনিকের মতে পূর্ব্বতন কবিরা সব escapist—তাঁদের অনেকে ভগবানের, অনন্ত অসীমের সুদূর রহস্যের মধ্যে চেতনাকে অনুভবকে যে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, অনেকে আবার যে সসীমের পার্থিবের মধ্যে থেকেও কেবল দেখেছেন দেখিয়েছেন সৌন্দর্য্যকে সুরূপকে, সৃষ্টি যে "তুচ্ছেন অভ্বপিহিতং"

এ সত্যের উপর জোর দেন নাই,—আসল কথা ঠিক এদিক দিয়ে নয়। আসল কথা হল এই, (তাঁরা escapist এই জন্যে যে তাঁরা ঐহিকের লৌকিকের ব্যষ্টির মর্য্যাদা তেমন করে দেখেন নি। যাঁরা আধ্যাত্মিক সত্যকে সুন্দরকে দেখেছেন তাঁরা ব্যষ্টির ভিতর দিয়ে, তাকে অতিক্রম করে লোপ করে দিয়ে তবে সত্যে সৌন্দর্য্যে পৌছেছেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যষ্টির যে নিজস্ব মান মর্য্যাদা সত্য সৌন্দর্য্য আছে—তা যত ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর কানা খাঁদা বোচা টুঁটো হোক—আছে স্বকীয় সার্থকতা, তা ভুললে চলবে কেন? আর একথাটা বোঝাবার জন্যে, জোর করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই হয়ত বহু অধুনিকেরা পঞ্চ ম'কার সাধক তান্ত্রিক বামাচারী হয়ে উঠেছেন। বৈদান্তিক কবিরা ব্যষ্টি বা ব্যক্তিরূপের মাহাত্ম্যের কথা যখন বলেছেন তখন তার ভিতর দিয়ে ব্যষ্টি বা ব্যক্তির অতীত যা তাকেই দেখেছেন, তারই কীর্ত্তন করেছেন, ব্যক্তিকে ব্যষ্টিকে কেবল একটা খোলস, শূন্য কাঠামো হিসেবে রেখে। তা নয়, ব্যষ্টির ব্যষ্টি হিসাবে কি সার্থকতা—অনন্তে অসীমে—তাই দেখতে বুঝতে হবে। পূর্ব্বতন আস্তিক কবি বলেছেন তাঁর কাজ হল :

I may assert Eternal Providence
And justify the ways of God to men.

কিন্তু আমি বলতে চাই আধুনিক কবি-ঋষিদের ব্রত হল যেন ঠিক বিপরীত অর্থাৎ justify the ways of men to God—বস্তুর জীবের ব্যক্তিগত মর্য্যাদা, নাম রূপের নামরূপ হিসাবে বিশিষ্ট সার্থকতা, একান্ত ঐহিকের সান্তের পটে যদি সম্ভব না হয়—কারণ সে-দিক দিয়েই যত ভ্রান্তি অতৃপ্তি—তবে তাকে একটা উর্দ্ধতর গভীরতর দিব্যতর চেতনার মধ্যে ধরে, তার অঙ্গীভূত করে দেখাতে হবে।)

আধুনিক কাব্যের একটা পরিচয় আমি দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেবল ইংরেজী কাব্যের কথাই উল্লেখ করেছি। আধুনিক বাংলা কাব্যে

কি রূপ নিয়েছে তা ভবিষ্যতে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। তবে এখানে এইটুকু বলতে চাই বাংলা কাব্যের আধুনিকত্ব ততখানি তার আন্তর চেতনার উপলব্ধির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নয় যতখানি তা বিদেশী চিন্তার অনুভবের অনুকরণ, বিদেশী গ্রন্থগত ভাবের ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি। আমাদের রাজনীতিক, এমন কি সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে দেখি যে-সব সমস্যা প্রশ্ন আমাদের জীবনধারা হতে উদ্ভূত হয় নি, অথচ তাদেরই আলোচনায় ও মীমাংসায় আমরা ব্যতিব্যস্ত—বিদেশের ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন জীবনধারার অব্যর্থ সজীব প্রকাশ যা—আমরা তা নিজেদের উপর আরোপ করে নিয়েছি। সেই রকম কাব্যজগতেও দেখা দিয়েছে অনুরূপ পরিস্থিতি। দুই একজন হয়ত ঐ বিদেশীর স্বাভাবিক ভাবে ভঙ্গীতে নিজেকে এতখানি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন, এতখানি তা নিজের প্রাণবস্তু করে তুলেছেন যে তাঁদের মধ্যে আধুনিকতার সত্যকার একটা রস কোথাও পাই, কিন্তু অধিকাংশ কাব্যসৃষ্টিই মনে হয় কৃত্রিম প্রাণহীন বাহ্য ঠাট মাত্র।

ইংরাজী ও ফরাসী

ফরাসী বুদ্ধি অত্যন্ত বাঁধন-ছাঁদনের পক্ষপাতী। বুদ্ধির অর্থাৎ যুক্তিগত বুদ্ধির ধর্ম্মই এই বিশ্লেষণ, সংজ্ঞানির্ণয়, শ্রেণীবিভাগ, প্রত্যেক বস্তুর পৃথক পৃথক যথাযথ স্থাননির্দ্দেশ, অবান্তরের পরিহার, আশেপাশের সাথে সম্মেলন সামঞ্জস্য, আগের পরের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্য। এই শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য ফরাসী বুদ্ধির ঋজুতার ও স্বচ্ছতার পরিচয়। ফরাসীভাষাও তাই ফরাসী-বুদ্ধির প্রতিকৃতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুসংগঠিত গাঢ়বন্ধ। বস্তুত ফরাসী-ভাষা বুদ্ধির দ্বারা যতখানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, পৃথিবীর আর কোন ভাষা এতখানি হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বুদ্ধির প্রভাব দুটি প্রাচীন ভাষার উপর বিশেষরূপ হয়েছিল লক্ষ্য করা যায়—এক লাতিন আর এক সংস্কৃত। ফরাসী অবশ্য লাতিনেরই দুহিতা, সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী। তবে কি লাতিন কি সংস্কৃত কারও বনিয়াদ বুদ্ধি নয়। লাতিনভাষার (এবং তার সাহিত্যের) গোড়ার প্রতিষ্ঠা হল প্রাণশক্তি—তেজঃ, ওজঃ, বীর্য্য: তবে বুদ্ধি এসে এই প্রাণ-শক্তির উপর চেপে বসেছে, জোর করেই তাকে সংযত সংহত নিরেট এমন কি কঠোর পর্য্যন্ত করে তুলেছে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতের উৎস ও মূল একটা ইন্দ্রিয়গত সুকুমার স্পর্শালুতা (ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনও এক ইন্দ্রিয়, ভারতীয় মতে)। এ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় হতে বুদ্ধির দিকে গতি অনেক বেশি সহজ স্বাভাবিক—বুদ্ধি এখানে তার প্রভাব বিস্তার করেছে নিগ্রহ করে নয়, তার সঙ্কল্পশক্তির জোর খাটিয়ে নয়—লাতিনের মত—কিন্তু তার আলো-কের, তার প্রসন্ন-প্রভার স্বতঃস্ফুরণে। আবার গ্রীক সম্বন্ধে বলা যেতে

পারে যে তার নিভৃত ভিত্তি হল চিত্তের সৌন্দর্য্যবোধ, এখানে চিন্তাবৃত্তি গড়ে উঠেছে ও ভাষাকে রাঙিয়ে দিয়েছে ঐ সৌষীম্যবৃত্তিকে আশ্রয় করে।

গ্রীক পুরাণে বলে যে জ্ঞানের দেবী এথেনা অস্ত্রশস্ত্রে কবচকুণ্ডলে পূর্ণসজ্জিত হয়ে দেবরাজ জিয়ুসের মস্তক হতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকমই মনে হয় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সোজাসুজি ফরাসী জাতির মগজ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে। মানুষের অন্যান্য সকল অঙ্গ ও বৃত্তি তুলে ধরা হয়েছে মস্তিষ্কের মধ্যে, তাদের দেখা হয়েছে, গড়া হয়েছে চালনা করা হয়েছে ঐ বুদ্ধির ধর্ম্মে। ইংরাজীর সাথে তুলনা করলে কথাটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফরাসী ভাষা যে-পরিমাণে সহজে ও স্বভাবতই স্বচ্ছ সংহত, মার্জ্জিত সুগঠিত, যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলা-পারিপাট্য-সৌষ্ঠব-শ্রীমণ্ডিত; ইংরাজী ঠিক সেই পরিমাণে স্বভাবত হল বন্ধনশূন্য, বিশৃঙ্খল, বাহুল্য ও জটিলতাপূর্ণ—তাদের দেশের আবহাওয়ার মত কেমন ঘোলাটে ধোঁয়াটে কুয়াসা-কুহেলীময়। তুলনা করা যেতে পারে ফরাসী কর্ণেই বা রাসীন আর ইংরাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি শেক্সপীয়র। ইংরাজীতে সংযত স্বচ্ছতা, সরল শালীনতা, সহজ পারিপাট্য ফুটিয়ে তোলা রীতিমত প্রতিভার প্রয়োজন—ফরাসীর তা স্বভাবসিদ্ধ, মাতৃস্তন্য হতেই আহৃত।

কিন্তু অন্য দিক থেকে আবার যেটি গুণ সেটিই অবস্থা বিশেষে ক্ষেত্র বিশেষে দোষ হয়ে দাঁড়ায়—যেমন দোষ যেটি সেটি গুণে পরিণত হয়। ফরাসীর গুণ যেটি নির্দ্দেশ করলাম সেটি বিশেষভাবে ফরাসীর গদ্যের গৌরব—এই গুণটির জন্যই ফরাসী গদ্য-সৃষ্টির তুলনা নাই। কিন্তু অনেকে বলেন কাব্যের উর্দ্ধতম গতি তাতে যেন ব্যাহত হয়েছে; কবিত্বের যে স্বকীয় ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল সে জিনিষটি এখানে বুদ্ধির যুক্তির প্রখর আলোকে ফুটে উঠতে পারে নাই। কাব্য মনে হয় এখানে সহজ-সৃষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় নাই—তাকে যেন ধরে গড়া, তৈরী করা হয়েছে। কারিগরের

হাতের নিপুণতা আছে, চমৎকারিত্বও আছে, কিন্তু নাই যাদুকরের অভাবনীয়তা, অনির্ব্বচনীয়তা—নাই, ইংরেজ কবি যাকে বলেছেন magic hand of chance—কাব্যরচনা এখানে যেন একান্ত অলঙ্কার-শাস্ত্রেরই অঙ্গ। পক্ষান্তরে, ইংরাজের চেতনায় যুক্তির বিচারের চিন্তার ভার চেপে রয় নাই—সে-চেতনা চলে প্রাণের অনুভবের অন্তঃপ্রেরণার অবাধ দূর-প্রসারী প্রবেগে। মনকে মস্তিষ্ককে সে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, সাজিয়ে গুছিয়ে, তার চারিদিকে আটঘাট বেঁধে বা দেওয়াল তুলে ধরে নি। ইংরেজী বাগান কাকে বলি? না, মানুষের হাত যেখানে একান্ত রূঢ় হয়ে দেখা দেয় নি, যেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপটি কিছু বজায় রয়েছে, প্রকৃতির ধরণ-ধারণ অনুসরণ করা হয়েছে—নিয়মের মধ্যে অনিয়ম, গোছালোর মধ্যে কিছু অগোছালো, অন্য পক্ষে ফরাসী বাগিচা কাটাছাঁটা বাঁধাছাঁদা, আট-সাট যেন জ্যামিতিক নক্সা, পটে-আঁকা ছবি। ইংরাজের মনের খেলায় তাই দেখি প্রকৃতির আনকোরা অপ্রত্যাশিত আচম্বিত গতি-বৃত্তি ফুটে উঠবার অবকাশ পেয়েছে। জাগ্রত মনের, ব্যক্ত চেতনার হাবভাব কেবল নয়, পরন্তু সে-মনের চেতনার আশে-পাশের উপর-নিচের দূরতর প্রচ্ছন্নতর জগতের আভাষ ইঙ্গিত এসে ইংরাজী কাব্যকে একটা রহস্যময় অপরূপত্বে মণ্ডিত করে দিয়েছে। কীটসের magic casements অথবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের farthest Hebrides কি old Triton যে-জগতের দুয়ার আমাদের চোখের সম্মুখে খুলে দেয় তার সমতুল ফরাসী কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সুদুর্ল্লভ। ভেরলেন বা মালার্মে এদিকে কিছু অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ইন্দ্রজাল অন্য ধরণের। ইংরাজ কবি সত্যসত্যই মিস্‌টিক—বাক্যে অর্থে তিনি যতই লোকায়ত, ইহমুখী, ইন্দ্রিয়পর হোন কেন, তাঁর গূঢ়ভাব, ব্যঞ্জনা, ধ্বনি হ'ল mystic, অমূর্ত্ত-অতীন্দ্র-অভিমুখী; আর ফরাসী কবির বক্তব্য যতই মিস্‌টিক হোক না, তাঁর ভঙ্গী, তাঁর সুর ও রেশ এনে দিয়েছে ঐহিক-প্রিয়তা। ভেরলেন-এর:

O ces mains ces mains venerées
Faites le geste que pardonne*

এ mysticism-এর মধ্যে mist কিছু নাই—এর যে সৌন্দর্য্য তা লোকায়ত কিন্তু শৈলীর—

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow—

এই profanism কুহেলীতে, mysticism-এ ভরপুর। ফরাসীরা কাথলিক, মূর্ত্তিপুজা করে—ইংরাজ প্রোটেষ্টণ্ট নিরাকারের পুজারী।

কথাটি কিন্তু আরও একটু বলতে হয়—ফরাসীর কাব্য-সৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে। ফরাসী কবিতার বিষয়ে ম্যাথু আরনল্ডের অভিযোগটি সুপরিচিত —ফরাসী কবিতা তাঁর প্রাণকে স্পর্শ করে না, কোন স্পন্দনই সেখানে তুলতে পারে না। অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্যরসিক ম্যাথু আরনল্ডের কথায় সায় দেবেন, দিয়ে থাকেন। ইংরেজী কবিতার পরে ফরাসী কবিতা মনে হয় যেন কেমন কবন্ধ—উপরের দিকটায় কি খানিকটা একেবারেই নাই, কেটে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। আর সব অঙ্গ রয়েছে এবং যা রয়েছে তা সুঠাম সুডৌল সুচারু কিন্তু যে বস্তুটি এনে দেয় অলৌকিকত্ব বা আসে আর এক জগৎ হতে, যাতে কবিতা হয়ে ওঠে কবিত্বময়, তারই যেন অভাব।

সিদ্ধান্তটি এবং যে অনুভূতির উপর সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠিত তা কতকটা ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু কতকটা মাত্র, সবটা নয়। এখানে এই ভুল করা হয় যে-জিনিষের বিচার আমরা করি তাতে কি নাই, তার অভাব কি তাই দিয়ে; কিন্তু জিনিষের আসল পরিচয়, তার সঠিক মূল্য নির্ণয় হতে পারে তার কি আছে, কি সে দিয়েছে তাই দিয়ে—অভাব দিয়ে নয়, ভাব দিয়ে। এই "ভাব" অনেক সময়ে আমরা খুঁজে পাই না, কারণ

* "ঐযে ঐযে বরণীয় হাত দুখানি—অপরাধভঞ্জন ভঙ্গী তোমাদের দেখি ত তবে।"

এক জিনিষের বিচার করতে গিয়ে মনে রাখি আর এক জিনিষের কথা, এক ক্ষেত্রের তৌল আর এক ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। ফরাসীকে ইংরাজীর মাপে ওজন করা ন্যায়-সঙ্গত নয়।

ফরাসী কবিতা, সাহিত্য, শিল্প দিয়েছে কি? অতীন্দ্রিয়ের,—অতীন্দ্রিয়মুখী কোন ইন্দ্রজাল—কেণ্টিক-রহস্য নয়; কথাটি ঠিক। কিন্তু সে দিয়েছে ইন্দ্রিয়েরই এক ইন্দ্রজাল, তার নিজস্ব, তার লাতিন-স্বভাবানুগত এক মনোহর বৈশিষ্ট্য। যদি তাকে "ম্যাজিক" না বলতে চাও ক্ষতি নাই, কিন্তু এ যে শুধুই "লজিক," তাও আবার নয়। ফরাসী দিয়েছে ভঙ্গীর সুষমা পারিপাট্য মার্জ্জিত-শ্রী। তার মনোভাব, তার বক্তব্য ও অর্থ হয়ত খুবই স্পষ্ট, পরিচিত—দৈনন্দিন ব্যাপার, ব্যবহারিক বৃত্তিকে ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না, একান্ত মাটি-ঘেঁষা তার চিন্তা-অনুভূতি; কিন্তু এ সকল রূপান্তর ঘটাবার প্রতিভা তার আছে—কারণ তার আছে নিবিড় অথচ সংযত স্পর্শালুতার—হোক না কেন তা স্থূল স্নায়ুগত ছন্দায়িত স্পন্দন, তার অভ্রান্ত সহজ সৌন্দর্য্য-বোধ। সে যা বলে তা গুছিয়ে সাজিয়ে ত বলেই, অধিকন্তু তাতে মিশিয়ে দিতে জানে এক ধরণের রসায়ন—লোকায়ত বা লৌকিক রসায়ন—আত্মিক বা ঊর্দ্ধস্থ বা প্রচ্ছন্ন চেতনার রহস্যময় রসায়ন, যদিও তা নয়। অন্য ভাষায় যে-সকল কথা শিষ্ট সমাজে বলা চলে না, বললে তা হয়ে পড়ে রূঢ় রুক্ষ অশোভন গ্রাম্যতা-দুষ্ট—ফরাসী ভাষার পোষাকে তা কেমন চমৎকার ভদ্র শ্রী লাভ করে।*

ফরাসীরা কথা বলাটা খুব ভাল বাসে এবং বলতেও জানে সুন্দর করে। তারা যখন কথা বলে মনে হয় কথা বলছে না, বক্তৃতা দিচ্ছে। কথার

---

* তুলনা করা যেতে পারে শেক্সপীয়রে ও মোলিয়েরে গ্রাম্যতা। শেক্সপীয়রের গ্রাম্যতা ছিল অতি-সাধারণ ভূন্যাসীন দর্শকদের উপভোগের জন্য আর মোলিয়ের চেয়েছিলেন মুখ্যত রাজ-পরিষদ ও পরিষদবর্গের প্রীতি সম্পাদন করতে। মোলিয়েরে গ্রাম্যতা আর গ্রাম্যতা নাই, হয়ে উঠেছে "নাগরিকতা"।

জন্যে কথা, কথার বাহাদুরী তাদের সাহিত্যে কাব্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। ইংরাজের কথার মূল্য (আমি বলছি সাহিত্য বা কাব্যগত কথার বিষয়) কথায় নয়, এমন কি কথার অর্থেও নয়—কথার, অর্থের আর একটা অতিরিক্ত কিছুতে। এই অতিরিক্ত-কিছুর সাথে ফরাসীর বিশেষ পরিচয় নাই—তার সমস্ত লক্ষ্য ঐ বাক্যের ও অর্থেরই মধ্যে। বাক্যটি হবে সুগঠিত, অর্থবান—গদ্যের লক্ষ্যও এই, তবে কাব্যের গঠন আরও সুগঠিত, তার অর্থ আরও অর্থবান হওয়া চাই। এখানে গদ্যে ও কাব্যে পার্থক্য প্রকৃতির নয়, কেবল ক্রমের। ইংরাজী কবিচেতনা যেন বলছে "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য"; ফরাসীর কবিচেতনা বলছে "রীতিরাত্মা কাব্যস্য"। কিন্তু রীতিরও আছে কুহক, নিজস্ব আভা—সেটিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও সার্থক। ভেরলেন যখন বলছেন—

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encor de vos derniers baisers*

অথবা Samain এর

Et Pannyre devint fleur, flamme, papillon †

এখানে অলৌকিক রহস্য কিছুই নাই—সবই একান্ত লৌকিক কিন্তু লৌকিকতার চারপাশে কি যে সৌরভ একটা ছড়িয়ে পড়েছে তার একটা ইন্দ্রজাল আছে বৈ কি—আকাশের নয় মাটির ইন্দ্রজাল, কিন্তু প্রায় সমান চমৎকার। লোকায়তকে ফরাসী অলৌকিক বা লোকাতীত পদে তুলে ধরে নাই বটে কিন্তু তাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা আমার মনে হয় আবিষ্কার করেছে লোকায়তেরই নিজস্ব একটা রসময় অন্তরাত্মা।

* তোমার তরুণ বুকখানির উপর আমার মাথাটি গড়িয়ে পড়তে দাও—সে মাথা এখনও যে তোমার শেষ চুম্বন-রাজির ঝঙ্কারে ভরপুর।

† (নটী) "পানীর" হয়ে উঠল ফুল, আগুনের শিখা, প্রজাপতি—

ইংরাজ কবি দয়িতাকে Phantom of delight—অশরীরী কিছু না বলে সন্তুষ্ট হবেন না। পাখী হবে blithe spirit, ethereal minstrel, a voice, a mystery—দেহী মানুষ আর এক-জগতের অধিবাসী, cometh from afar—শিল্পীর এখানে মূলমন্ত্রই যেন, things are not what they seem—বিষয়-বস্তু কথা সবই আশ্রয় অবলম্বন, যেন fairy lands forlorn-এ যাওয়ার জন্য। ফরাসীরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেশি কাণ্ডজ্ঞানী বহির্ম্মুখী ইহাসক্ত ইন্দ্রিয়পর। বিচার বিতর্ক যুক্তির ধর্ম্ম এই—তার ঝোঁক স্পষ্ট স্ফুট প্রকট অর্থাৎ স্থূলের দিকে। ফরাসী কবি যখন দেহের কথা বলেন, তিনি দেহকে দেহ হিসাবেই দেখেন, আত্মার প্রতীক বলে দেখার অভ্যাস তাঁর নাই। দেহের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা তিনি দেবেন একে একে, খুঁটে খুঁটে, নম্বর দিয়ে—মোটের-উপরের সাকল্যের, অস্পষ্টের আবছায়ার সৌন্দর্য্য তিনি পছন্দ করেন না। স্পষ্ট দৃঢ় রেখায় পুঙ্খানুপুঙ্খের চিত্রণ—ফরাসীর বড় বড় স্রষ্টাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এখানে ফরাসীর সাথে বাঙ্গলার একটা সাদৃশ্যের উল্লেখ করতে চাই। উভয়ের মূর্ত্তি-পূজার কথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি। বাঙ্গালীর কবিতাও ফরাসী কবিতার মত স্বভাবত সুষীম সুস্পষ্ট, বাক্যের ও অর্থের দিক দিয়ে। অবশ্য এ কথাটুকু স্বীকার করা ভাল যে ফরাসীর অর্থ-গৌরব আমরা পুরাপুরি পাই নাই, তার পারিপাট্যও একান্তভাবে আমাদের দখলে আসে নাই। তবে উভয় ভাষার মূল প্রকৃতি এক, উভয়ের ঝোঁক একই দিকে—পার্থক্য এসে পড়েছে পরে, ক্রমবিবর্ত্তনের পথে। কারণ বাংলা তার স্বভাবের পথে সোজা চলে যায় নাই, রবীন্দ্রনাথ এসে তাকে বাঁকিয়ে দিয়েছেন। ইংরাজীর কাব্যরসে বাংলা অভিসিঞ্চিত হয়েছে অনেকের হাতে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতখানি যে-ভাবে ও-জিনিষটি এনে দিয়েছেন তাতে মনে হয় বাংলার রূপান্তর, ধর্ম্মান্তরই একটা ঘটেছে। যে রহস্যময়তা প্রহেলিকা-প্রিয়তা, প্রকট হতে জাগ্রত হতে উৎক্রান্তি, আমি বলেছি

ইংরাজী ও ফরাসী

ইংরাজী কবিত্বে পেয়েছে বিশেষ প্রাধান্য সেই গিরিপ্রস্রবণের সমুচ্চ ধারাটিই রবীন্দ্রনাথ বাংলার সমতলে এনে ফেলেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ তার ইন্দ্রজাল, তাঁর অলৌকিকতা সৃষ্টি করেছেন একটা বিশেষ ভঙ্গীতে, বিশেষ একটা কৌশল আশ্রয় করে, প্রায় বলতে পারা যায়। বাক্যের স্পষ্টতা তিনি নষ্ট করেন নাই, কাঠামোটি যথাসম্ভব সুসমঞ্জস পরিপাটি করে—বুদ্ধি বা যুক্তি গঠিত যদি না হয় তবে বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য করে দেখিয়েছেন। অর্থের বাহনকে নয় তবে, অর্থকেই তিনি দিয়েছেন শিথিলবন্ধ করে—বাহিরের গঠনটি সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত, কিন্তু ভিতরের বস্তুর চিত্র অসম্পূর্ণ অনিশ্চিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অস্পষ্টতা দোষটি এক সময়ে খুব বেশি করে দেখান হত—তার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই এখানে। অন্যত্র হয়ত এ দোষটি দোষই, কিন্তু বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে এ দোষ গুণে, বিশেষ-গুণেই পরিণত হয়েছে। এর কল্যাণে একটা নূতনতর সম্ভাবনা বাংলার কাব্য-প্রকৃতির মধ্যে দেখা দিয়েছে। ফরাসীরাও অনুরূপ চেষ্টা করেছে—তবে সজ্ঞানে, দেখেশুনে বুঝেসুঝে। ফরাসী কাব্যসৃষ্টির যে অতিস্পষ্টতা, দিনের প্রখর স্বচ্ছতা, তাকে গুলিয়ে ঘোলাটে করে, আবছায়ায় ঢেকে, অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় করতে চেয়েছিল সিম্বলিষ্ট (প্রতীকতন্ত্রী) সম্প্রদায়। তবে বাঙ্গালীর কবি হতে তারা গিয়েছিল একটু ভিন্নপথে। অর্থকে মুখ্যত তারা ঘোলাটে করে দিতে চায় নাই—এখানেও তারা তাদের মস্তিষ্ককে ঠিক রেখে চলতে চেয়েছে; তারা নেড়ে চেড়ে, এলোমেলো করে, অনিশ্চিত করে দিতে চেষ্টা করেছে মুখ্যত অর্থের বাহন যা-কিছু তাকে—বাক্যকে, রূপাবলীকে (imagery), ছন্দকে অলঙ্কারকে। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের—

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা—

এখানে বাক্যের ছাঁদ সুদৃঢ়, রূপক সুনিশ্চিত, আলেখ্যটি স্পষ্ট রেখায় সুষীম—কিন্তু এই কাঠামো ধরে আছে ঘিরে আছে যে বস্তু—সেই ভাব সেই

অর্থ কেমন কুহেলিকুয়াসাময়, অনিশ্চিত অবাস্তব রহস্যময়—যেন ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতাংসন্নিপাতঃ। এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে এই যেমন র‍্যাঁবোর (Rimbaud)

Il entend leurs cils battant sous les silences
Parfumés—

"সে শোনে তাদের চোখের পাতা কাঁপছে সুবাসিত স্তব্ধতার তলে—" অর্থ এখানে নিজে কিছু অস্পষ্ট বা দুর্গ্রাহ্য নয়; কিন্তু উপমা অলঙ্কারে আনা হয়েছে একটা মিশ্রণ,—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে একাকার করে দেওয়া হয়েছে—বক্রতাকে, ধ্বনিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য।

ফরাসীর মনবুদ্ধি যুক্তিপ্রধান, দারুণ নিয়মানুগ—সুতরাং তাতে স্বভাবতই দেখা দেয় একটা সঙ্কীর্ণতা। ইংরাজের "দ্বৈপায়ন" সঙ্কীর্ণতা প্রসিদ্ধ, কিন্তু সেটি প্রধানত জীবনের দিক দিয়ে—বুদ্ধির, বিশেষভাবে সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা উদারতাই বরং তার মধ্যে ফুটে উঠেছে; বুদ্ধি তার সুতীক্ষ্ণ নয়, একান্ত ন্যায়শাস্ত্রানুগত নয় বলেই তাতে এসেছে একটা সহজ-নম্যতা। ফরাসীর ঠিক বিপরীত—বুদ্ধির ক্ষেত্রে সে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু প্রাণের খেলায়, জীবনের ধারায় তার রয়েছে সহৃদয়তা, ঔদার্য্য, নমনীয়তা। নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য ছাড়া অন্যের ভাষা অন্যের সাহিত্য সম্বন্ধে ফরাসীর ঔৎসুক্য তেমন নাই, সে-সব জানা বা আয়ত্ত করার সামর্থ্যও তার বেশি নয়। নিজের ভাষা ও সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠ (প্রায় রক্তের) সম্বন্ধ যে ভাষা ও সাহিত্যের—যথা, লাতিন—এমন অন্য ভাষা ও সাহিত্যের সাথেই তার যা কিছু সহজ ও নিকট পরিচয়। তার নিজের ভাষা ও সাহিত্য এমন একটা বিশিষ্ট, স্বকীয়, সুদৃঢ় রূপ পেয়েছে এবং তার কল্যাণে ইউরোপের মনোময় জগতে সে এতদিনও এতখানি প্রভুত্ব করে এসেছে * যে অপরের বৈশিষ্ট্য

* যার জন্যে এক সময়ে বলা হ'ত প্রত্যেক মানুষের আছে দুটি স্বদেশ—তার নিজের জন্মভূমি আর ফ্রান্স।

বা অস্তিত্ব তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য গড়ে উঠেছে পুষ্ট হয়েছে বহুল জাতির, বহুল ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শের সম্মেলনের ফলে। ইংরাজী ভাষায় বৈদেশিক হাবভাব রূপরস যত সহজে ও যথাযথ প্রকাশ করা যায়, ফরাসীতে ও-জিনিষটি সেই অনুপাতেই দুষ্কর ও অসম্ভব। ইংরাজী বাইবেল অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্য; ফরাসীতে বাইবেল তেমনি অতি-সাধারণ অকিঞ্চিৎকর। ফরাসীভাষায় ও সাহিত্যে দেখা যায় ক্রমপরিণামের একটা সুস্পষ্ট ধারা, একটা অচ্ছেদ্য পারম্পর্য্য—মনে হয় একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত জীবই যেন নিজের ভিতর হতে চেতনার বিকাশের সাথে সাথে বাহিরে ও তদনুসারে ধাপে ধাপে পুষ্ট উপচিত হয়ে চলেছে; বাহির হতে সে অবশ্য জীবনধারণের, জ্ঞান-অভিজ্ঞতার, শিল্পসাহিত্যসৃষ্টির জন্য উপকরণ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু তা সব সে একান্ত আত্মসাৎ করে নেয় —বাহ্যবস্তুর বাহ্যত্ব কিছু থাকে না, হয়ে পড়ে একটা গৌণ অবলম্বন মাত্র। ফরাসীভাষার সাহিত্যের তাই দেখি রয়েছে বা গড়ে উঠেছে একটা সুস্পষ্ট সুদৃঢ় ব্যষ্টিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব—একটা বিশেষ কাঠামোর, একটা বিশেষ ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে তার ধর্ম্মকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ও আবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইংরাজের ভাষা ও সাহিত্য এ রকম আত্মস্ফুরণের ফলে যে গড়ে উঠেছে তা মনে হয় না—পরস্পর হতে বিভিন্ন বিবিধ বিসদৃশ এমন কি বিরোধী উপকরণ এক-সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এ শতমিশালী জিনিষটি তৈরী হয়েছে। এর একটা বিশেষ কেন্দ্র নাই, একই কেন্দ্রের চারিদিকে একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্ব এর গড়ে ওঠে নি। এর প্রত্যেকটি অঙ্গ স্ব স্ব প্রধান—ইংরাজের সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষভাবে পৃথক পৃথক শিল্পীর ব্যক্তিগত ইতিহাসের সমষ্টি। ফরাসী শিল্পের ইতিহাস একটা সমবেত চেতনার নানা ব্যক্তির ভিতর দিয়ে বিবিধ বিকাশের ইতিহাস। ইংরাজের ভাষায় সাহিত্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্য স্বাচ্ছন্দ্য সহজনম্যতা। তুলনায় ফরাসী অনেকখানি শৃঙ্খলিত অনমনীয়—রূপহীনতা, অনিশ্চয়তা সে চায় নি, চেয়েছে স্পষ্টতা, পরিচ্ছিন্নতা, যথাযোগ্যতা।

ইংরাজীর প্রকৃতিতে রয়েছে কেমন আদিম জীবধর্ম্মের একটা তারল্য, সাধারণ্য, সহজ পরিবর্ত্তনশীলতা—ফরাসীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণপরিণতের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যপরায়ণতা (specialisation), সুতরাং কাঠিন্যের, এমন কি আড়ষ্টতার দিকে প্রবণতা। মোটের উপর বলা যেতে পারে, ফরাসীর হল জ্ঞান-শক্তি, ইংরাজীর প্রাণশক্তি। তবে ফরাসীর জ্ঞানশক্তি একটা সুকুমার ঐন্দ্রিকতা-আশ্রয়ী আর ইংরাজীর প্রাণশক্তি একটা ঊর্দ্ধদৈহিক কল্পনা-অভিসারী।

ফরাসীর গড়ে উঠেছে একটা সুদৃঢ় মানসরূপ। সে অন্যের চক্ষু দিয়ে দেখতে অক্ষম বটে, কিন্তু তার নিজের চক্ষু আছে এবং সে-চক্ষু দেখতে জানে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে, এইটিই প্রধান কথা, অনেকের যে এই দৃষ্টিশক্তিই নাই। তার একটা বিশেষ ছাঁচ আছে, ধারা আছে—তার ভিতরে ফেলে তবে সে বিশ্বকে দেখে, তবুও সে দেখেছে বিশ্বকেই অর্থাৎ তার চিন্তা কৌতূহল অনুভব বহুল বিচিত্র সর্ব্বতোমুখী। তার মনের ছাঁচ শক্ত, কিন্তু তাতে সে ঢালাই করেছে (যদিও ফরাসী ছাপে) বিশ্বের যাবতীয় জিনিষ, মানুষ যা কিছু আপনার বলে বিবেচনা করে বা যেখানে যে রস পায়। এই রকমেই ফরাসীর গড়ে উঠেছে একটা সুপরিচ্ছন্ন সমর্থ সংস্কৃতি। এবং সমস্ত ইউরোপের মানবজীবন এই সংস্কৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। জর্ম্মনী এই প্রভাব মানতে চায় নি, তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছে, চেয়েছে লাতিনের পরিবর্ত্তে নিজের নর্ডিক (Nordic) সংস্কৃতি। তাইত ফরাসীতে জর্ম্মনীতে অহি-নকুল সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

ইংরাজেরও সাম্রাজ্য আছে, ফরাসীরও আছে। কিন্তু বিজিতের সাথে সম্বন্ধ এবং ব্যবহার উভয়ের সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। ইংরাজ তার Pax Britannica অক্ষুণ্ণ রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট—পরের ধর্ম্ম নীতি শিক্ষা দীক্ষা আচার আইন কিছুতে সে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। কিন্তু ফরাসী শুধু শান্তি শৃঙ্খলা নয়, চাপিয়ে দিতে চায় তার সংস্কৃতি, Scientia

Franca। ইংরেজ দেহটিকে অধিকারে রাখাই যথেষ্ট বিবেচনা করে—মনের উপর অধিকার, সেটি গৌণ, আপনা হতে যা হয়ে যায়—ও দিকে কোন চেষ্টা নাই এবং চেষ্টা করা প্রয়োজন ও যুক্তিসঙ্গত নয় বলেই তার বিশ্বাস। ফরাসীর চেষ্টা মনটি সম্পূর্ণ অধিকার করা—সেখানে কোন স্বাতন্ত্র্য স্বধর্ম্মের বীজ যাতে না থাকতে পারে, এই তার শাসনপদ্ধতি। এখানে ইংরাজের দ্বৈপায়ন প্রকৃতি তাকে বিদেশীর হতে দূরে দূরে থাকতে বাধ্য করেছে, অন্যদিকে ফরাসী বিদেশীর সাথে মিলে মিশে তাদেকে আপনার মধ্যে আত্মসাৎ করে নিতে চেয়েছে।

বাংলা লিপি-সংস্কার

বাংলা লিপি পরিবর্ত্তনের কথা উঠেছে। কেউ দেবনাগরী কেউ রোমান হরফের পক্ষপাতী। অভ্যাস ও সংস্কার অবশ্য অন্ধভাবে গতানুগতিককেই জোর করে ধরে থাকতে চায়, কিন্তু প্রয়োজনের ও সুবিধার দাবী বেশি বিবেচিত হলে বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে অতীতকে অকাতরে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয় কি? পুরাতন হলেই যে তা সাধু আর নতুন হলেই যে তা অসাধু এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই। কথাটি ঠিক বটে, কিন্তু এও আবার আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে পুরাতন হলেই তা অসাধু, আর নতুন হলেই তা সাধু হয়ে পড়বে এমনও কিছু বাধ্যবাধকতা নাই। সে যাহোক—

আমরা রোমান হরফের প্রস্তাবটি সম্মুখে রেখে আমাদের বক্তব্যটি বলব; কারণ ওটি হ'ল যাকে বলা যায় চরম প্রস্তাব (extreme case)। রোমানের তুলনায় দেবনাগরী ত ঘরোয়া জিনিষ—তাই ওটির আলোকে আশা করি লিপি-সংস্কারের পুরাপুরি অর্থ ও ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। লিপি-পরিবর্ত্তনের মোটামুটি দুটি প্রয়োজন দেখান হয়। প্রথম, ওতে বিদেশী ও বিভাষীর সাথে আদান প্রদান, মিতালী, মিলনের বাধা অনেক কেটে যাবে। দ্বিতীয়, বর্ত্তমানে যে ৬০০ (ছয় শত) অক্ষর শিখতে হয় তার পরিবর্ত্তে মোটে ৪০ (চল্লিশ)-টীতে কাজ চলে যাবে—শিক্ষার্থীর সময় ও শ্রমের লাঘব এবং ছাপা, টাইপ, সর্টহ্যাণ্ড সহজসাধ্য হবে। প্রথম হেতুটি বহুদিন বহুমুখে চলিত হয়েছে; কিন্তু ওটির সারবত্তা আমি কোনদিনই সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। এক-লিপির কল্যাণে ভিন্নভাষাভাষীরা যে সামীপ্য বা সাযুজ্য লাভ করে, পরস্পরকে, পরস্পরের সাহিত্যকে সহজে

বুঝতে ভালবাসতে পারে, এ কথার প্রমাণ পাই না। বিদেশীর ভাষা জানতে ও শিখতে যারা চায় ও পারে তাদের সংখ্যা চিরকালই মুষ্টিমেয়, সাধারণ বেশির ভাগ লোকের পক্ষে অন্যের ভাষা আয়ত্ত করবার গরজ বা প্রয়োজন নাই। যে কয়েকজন বিদেশীয় ভাষা শিখতে চায়, তাদের পক্ষে বিদেশীয় লিপিটিও সেই সাথে শিক্ষা করা বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র। ওটুকু ক্লেশ অত্যধিক অত্যাচার বলে আমার মনে হয় না। শুধু তাই নয়, অনেক সময় লিপি শিক্ষা ভাষা শিক্ষার সহায় হতে পারে ; কারণ লিপির মধ্যে ভাষার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে—সে কথা পরে বলছি। ফরাসী, ইংরাজী, আধুনিক জর্ম্মন ভাষায় একই রোমান লিপি—কিন্তু এই লিপি-সাম্যের ফলে জাতি কয়টির পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা বোঝাবুঝির মাত্রা বেশী হয়েছে, না সহজ হয়েছে ? রোমান হরফে বাংলা লিখলেই যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা (সাধারণ লোকের কথা নাই তুললাম) রাতারাতি বাংলা শিখে ফেলতে পারবেন বা শিখতে তাদের আগ্রহ বেশি হবে, এমন ভরসা করা যায় না। বরং লিপি-সাম্যের ফলে একটা গোলমালও দেখা দিতে পারে—অনেক সময় দেখা যায় একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ আয়ত্ত করা খুব সহজ, কিন্তু জানা জিনিষের সাথে কিছু মিল আছে, বাহ্য সাদৃশ্য আছে, এমন বস্তু সম্যক আয়ত্ত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জর্ম্মন, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতির লিপি এক—কিন্তু হরফ এক হ'লেও তার উচ্চারণ ঐ সব ভাষায় যে সর্ব্বদা হুবহু এক নয় এ কথা আমরা সহজে ভুলে যাই। যে বর্ণটিকে রোমান হরফে লেখা হয় 'R' ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মনে তার উচ্চারণ এক নয়—কিন্তু হরফ সাম্যের ফলে বিদেশীরা ওটিকে একই মনে করে ও সেই ভাবে উচ্চারণ করে। *

---

*বাংলা 'ফ' = রোমান f বা ph, সচরাচর লেখা হয় কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। এ রকম আরও বর্ণ আছে যার উচ্চারণ রোমানে ঠিক ঠিক দিতে গেলে রোমান বর্ণটির গায়ে 'ফুটুকি ফাটকা' লাগিয়ে নিতে হবে—সেও কম জটিল হয়ে উঠবে মনে হয় না।

দ্বিতীয় হেতুটি সম্বন্ধে—ছাপা, বিশেষ টাইপ-লেখার দিক দিয়ে তার কতক যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া যেতে পারে হয়ত, কিন্তু শিক্ষার দিক দিয়ে যে তার খুব সারবত্তা আছে এমন মনে করি না। ৬০০ : ৪০ এই অনুপাত দেখে আমাদের প্রত্যয় হয়ে যেতে পারে বটে—কিন্তু ওটি হ'ল গোণাগুনতির, সাংখ্যায়ণের (statisitics) কারসাজি। ইংরাজী অক্ষর মোটে ২৬টি—ঠিক কথা, তবে বড় হাতের ধরলে অক্ষর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু এই ছাব্বিশটিকে ধরে কত রকম উচ্চারণ বৈষম্য আছে তার ইয়ত্তা নাই—একজন ফরাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন ইংরাজী উচ্চারণের নিরঙ্কুশতা সম্বন্ধে তার কি মত ; ফরাসীর নিজের ভাষাতেও যে ও-গুণটি একেবারেই নাই বলা চলে না। নামের ঠিক উচ্চারণের জন্য অনেক সময় নামধারীর কাছে যেতে হয় (Foch=ফোখ্ না ফোস্, এ নিয়ে অনেক বাতবিতণ্ডা চলেছিল ফরাসীদের মধ্যেই।)

এ সব বলার তাৎপর্য্য এই যে, লিপি সহজ করলেই যে ভাষাটিও সহজ হয়ে আসবে, এমন বলা যায় না। আরও কথা, শিক্ষণীয় জিনিষ সহজ কি কঠিন, তা অনেকখানি নির্ভর করে শিক্ষার ধরণের উপর। পাঁচ বৎসরের শিশুকে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত যুক্তাক্ষরসহ সম্পূর্ণ বর্ণমালা শিক্ষা দেবার চেষ্টা অত্যাচার বটে—যেমন ইংরাজী উচ্চারণের যত রকম বৈচিত্র্য হতে পারে তালিকা করে তা একসঙ্গে আয়ত্ত করবার বা করাবার প্রয়াস। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীকে শনৈঃ শনৈঃ পথ চলতে দিতে হয়।

বলা যেতে পারে, এ সব যুক্তি মেনে নিলেও রোমান হরফ গ্রহণের অযৌক্তিকতা প্রমাণ হয় না। কারণ রোমান হরফে কূট গ্রন্থীগুলি সহজ হয়ে যাবে শুধু, কিন্তু আগে যা সহজ ছিল তা সহজই থেকে যাবে, আরও কঠিন হয়ে পড়বে না। বাংলার লিপি সহজ হবে কিন্তু তার উচ্চারণ বা ব্যাকরণ থাকবে পূর্ব্ববৎ—সহজ বা অসহজ, যার কাছে যেমন বোধ হয়।

রোমান হরফে লিপি প্রণালী সহজ হবে কি না সে কথা ছাড়াও আমার আসল আপত্তি কি তা এখন বলতে চাই। আমি মনে করি ভাষার লিপি-পরিবর্ত্তন অর্থ শুধু "বাসাং'সি জীর্ণানি" পরিবর্ত্তন নয় তার চেয়ে বেশি কিছু পরিবর্ত্তন। লিপি ভাষার দেহ, দেহের পরিবর্ত্তন যদি কর তবে সেই সাথে অন্তরের পরিবর্ত্তন একটা ঘটবেই—এমন কি হয়ত অন্তরাত্মারও পরিবর্ত্তন এসে পড়তে পারে। কোন দেশে লিপি পরিবর্ত্তন যখন হয়েছে দেখি, তখন তার ভাষারও পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখি। বাঙ্গালী যদি তার কোঁচা ছেড়ে মালকোঁচা এঁটে দেয়, 'নাঙ্গা শির' না রেখে পরে টুপী বা পগ্‌গ, মাছ ভাত ছেড়ে খেতে সুরু করে ডাল রুটি, তবে সে যেন তার ভাষার জন্য দেবনাগরী গ্রহণ করে। আর আধুনিক তুর্কীর মত ইউরোপের হ্যাটকোট পান্তালুনকে তার জাতীয় পরিচ্ছদরূপে ব্যবহার করে, এবং হয়ে ওঠে মদ্যপায়ী মাংসাসী তবে যেন রোমান হরফে সে বাংলা লেখে। জাপানের শিক্ষা দীক্ষা যতদিন জাপানী ছিল ততদিন জাপানী লিপি তার পক্ষে (তার আধুনিকতার পক্ষেও) যথেষ্ট ও যথাযোগ্য ছিল—ইদানীং সর্ব্বতোভাবে সে ইউরোপীয় হয়ে পড়তে চাইছে, সুতরাং রোমান হরফ তার দরকার হতে চলেছে হয়ত। আমার বিশ্বাস লিপি-পরিবর্ত্তন অর্থ জন্মান্তর গ্রহণ। রোমান বা দেবনাগরীতে বাংলার আকার জোর করে হয়ত ঢালতে পারা যাবে—কিন্তু সে হয়ে উঠবে অন্য ধরণের বাংলা—বঙ্কিমের, রবীন্দ্রনাথের বা শরৎচন্দ্রের বাংলা নয়।

আরও একটি কথা। লিপি ভাষার জড় কাঠামো বা সঙ্কেত মাত্র নয়। লিপিরও আছে একটা প্রাণ, প্রকাশক্ষমতা, সৌন্দর্য্য। আধুনিক যুগে সুবিধার, ত্বরার, আশু-কার্য্যকারিতার চাপে সকল বস্তুরই এই প্রাণের, এই সৌন্দর্য্যের দিকটা ঢাকা পড়ে বা ক্ষয় পেয়ে গিয়েছে। গ্রীক ভাষাকে সহজেই রোমান হরফে লেখা যেতে পারে, কিন্তু গ্রীকের যে সৌকুমার্য্য, যে লাস্য, যে বলয়িত গতি তার লিপিতে ফুটে উঠেছে, রোমানের কাটা ছাঁটা

কঠিন রেখায় তার কিছু প্রতিফলিত হবে কি? এই রোমান লিপি আদিতে ঠিক আজকালকার মত ছিল না—বর্ত্তমানের ঐ কঠোর আ (সহজ হলেও হতে পারে) আকার তার হয়েছে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে পরে। প্রাচীন জগতে লিপি-কলা (Calligraphy) বলে যে একটা শি ছিল, তা উঠেই গিয়েছে।

আধুনিকেরা এখানেও বলতে পারে অবশ্য যে বর্ত্তমান যুগে ও জগ সৌন্দর্য্যবোধ যে লোপ পেয়েছে তা নয়—সৌন্দর্য্যের ধারণা অন্য রকম হ গিয়েছে মাত্র। সৌন্দর্য্য অর্থ ভূষণ, অলঙ্কার-আতিশয্য আর নয়—সব রকম বাহুল্য পরিহারই তার বৈশিষ্ট্য। রেখার অহেতুক গতিবিলাস বৈচিত্র্যও নয়—সারল্য, ঋজুতা, স্বল্পতাই আধুনিক গঠন-ছাঁদের লক্ষ্য আধুনিক স্থাপত্যে, আধুনিকের পোষাক পরিচ্ছদে এই তত্ত্বটিই প্রম করছে। কথাটি, শুনতে অবশ্য ভালই শুনায়, কিন্তু আশঙ্কা হয় সারল্যে দোহাই দিয়ে আমরা শ্রীহীনতার মধ্যে গিয়ে না পড়ি।

তবে আধুনিক—অতি-আধুনিক—বাংলা-সাহিত্যে মাঝে মাঝে বঙ্গ ভাষার যে মূর্ত্তি প্রকাশ পায় দেখি, মনে হয় এ যেন:

'সরস্বতী আবির্ভূ'তা পরিয়া বনেট'—

তার কণ্ঠে শুনি যেন গ্রামোফোনে উদ্গীরিত আধুনিক ইউরোপের আল্ডু উলফ, জয়েশের প্রতিধ্বনি। এ ধরণের সৃষ্টিই যদি ফ্যাসন হয়ে যায়, এ ধারায় চলেই যদি গড়ে ওঠে বাংলার ভবিষ্যতের সাহিত্য, তবে অবশ্য স্বীকা করি যথাসম্ভব শীঘ্র রোমান হরফ অবলম্বন করাই হবে স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত।